ধূপগুড়ি সিপিএম অফিসে কেএলও-র বেপরোয়া গুলি, হত ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়িঃ শনিবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি শহরের কেন্দ্রস্থলে সিপিএমের জোনাল কমিটির অফিসে এ কে-৪৭ ও এ কে-৫৬ রাইফেল নিয়ে আততায়ীদের সশস্ত্র হামলায় অন্তত ৪ জন নিহত এবং ১৩ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। তার মধ্যে ৫ জনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ গোপাল চাকির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। হামলাকারীরা কেএলও জঙ্গি বলে সিপিএম এবং পুলিশ, উভয়েই প্রাথমিক ভাবে জানিয়েছে। আহতদের ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। শনিবার রাতে কলকাতায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানান, এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ, রবিবার বিকেলে সিপিএম রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল বার করবে। জলপাইগুড়ি জেলা সিপিএম সম্পাদক মানিক সান্যাল জানিয়েছেন, ঘটনার প্রতিবাদে কাল, সোমবার জেলায় ১২ ঘণ্টার বনধ পালন করা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দিন সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি বাজারের মধ্যে সিপিএমের জোনাল কমিটি অফিসে প্রায় ২৫ জন নেতা-সদস্য বসে বৈঠক করছিলেন। সন্ধ্যা পৌনে ৭টা নাগাদ এলাকায় হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যায়। সেই সময় এক জন যুবক দোতলা পার্টি অফিসের নিচতলায় গিয়ে বনমালী রায় আছেন কি না জানতে চায়। আধো অন্ধকারের মধ্যে সেই যুবকের সঙ্গে পার্টিকর্মীরা যখন কথা বলছিলেন, তখনই সেখানে তিনটি মোটর সাইকেলে করে ৬ জন জঙ্গি গিয়ে থামে। মোটর সাইকেলগুলির স্টার্ট বন্ধ না-করেই তারা পার্টি অফিসের সামনে একটি বোমা ফাটায়। তার র এ কে-৪৭, এ কে-৫৬ রাইফেল ও ৯ মিমি পিস্তল থেকে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে ছুড়তে পার্টি অফিসের ভিতরে ঢুকে পড়ে। এর পর তারা গুলি চালাতে চালাতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যায়। সেখানেই ছিলেন গোপাল চাকি-সহ অন্যান্য নেতারা।

গোপালবাবু জঙ্গিদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পাঁচ মিনিট ধরে হামলার পরে জঙ্গিরা মেঠো পথ ধরে পালায়। জলপাইগুড়ি হাসপাতালে শুয়ে ধূপগুড়ি জোনাল কমিটির সদস্য তপন রাহা রায় বলেন, "আচমকা ওরা ঢুকে পড়ল। কিছু বোঝার আগেই দোতলায় উঠে সকলকে জখম করে পালিয়ে গেল।" তপনবাবুর গলায় গুলি লেগেছে। পুলিশের সন্দেহ, কেএলও-র 'অ্যাকশন স্কোয়াডের কমান্ডার' টম অধিকারীই ওই হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপার সিদ্ধিনাথ গুপ্ত জানিয়েছেন, "আহতদের মধ্যে কয়েক জন সিপিএম নেতা কার্যত মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। তাঁদের অধিকাংশই সংজ্ঞাহীন। তাই এখনই ঘটনা নিয়ে সবিস্তর কিছু বলা সম্ভব নয়।" তবে ওই হামলার ঘটনায় কেএলও জঙ্গিরা যে জড়িত, সেই ব্যাপারে পুলিশ সুপারের খুব একটা সংশয় নেই। জলপাইগুড়ি জেলা সিপিএম নেতৃত্ব তো বটেই, দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসও ঘটনার পিছনে কেএলও জঙ্গিরাই রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন।

ভর সন্ধ্যাবেলায় জমজমাট ভিড়ের মধ্যে বোমা ফাটিয়ে, গুলি চালিয়ে দুঃসাহসিক হানার ঘটনায় গোটা ধূপগুড়ি এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। হামলার কয়েক মিনিট পরে বাসিন্দারা এতটাই আতঙ্কিত হয় পড়েছেন যে গোটা ধূপগুড়ির সমস্ত দোকানপাট, বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তাঘাটও শুনশান। জলপাই-গুড়ি জেলা সিপিএমের সম্পাদক মানিক সান্যাল খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান। রাতে সেখানে মিছিলও করে সিপিএম।

শনিবার রাতে কলকাতায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানান, "পুলিশও বলেছে, আমরাও বলছি, এই কাজ কেএলও জঙ্গিদের। আমাদের পার্টি অফিসে যখন বৈঠক চলছিল তখন কেএলও জঙ্গিরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। তাতে রাত পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তাদের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ গোপাল চাকিও আছেন।

পরবর্তী কর্মসূচি কী হবে তা রবিবার সকালে সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব বৈঠকে বসে ঠিক করবেন। তবে, গোটা ঘটনায় সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব অত্যন্ত বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন। অনিলবাবু বলেন, "কেএলও পরিকল্পনা মাফিক এই ধূপগুড়ির এলাকাটি বেছে নিয়ে সিপিএমের নেতাদের উপর আক্রমণ হানছে। এর আগেও এক জেলা কমিটির সদস্য এবং সুভাষ সরকার নামে আরও এক জন জোনাল কমিটির সম্পাদককে কেএলও জঙ্গিরা খুন করে।" রাতেই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও ঘটনাটি জানানো হয়। এরপরে কি সিপিএম নেতৃত্ব উত্তরবঙ্গের নেতাদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করবে? পুলিশকে কি আরও নিরাপত্তা দিতে বলা হবে? জবাবে অনিলবাবু বলেন, "সে ব্যাপারে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ, টেলিযোগাযোগ বারবার ব্যাহত হওয়ায় রাতে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। বিস্তারিত তথ্য জানার পরই এই ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।" সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-এর রাজ্য সম্পাদক কার্তিক পাল এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। তৃণমূল নেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই ঘটনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই দায়ী। কারণ, আমরা গত তিন বছর ধরে বলছি, পশ্চিমবঙ্গ উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি হয়ে গিয়েছে। আর উত্তরবঙ্গই এদের করিডর। কিন্তু বুদ্ধবাবু বারবার আমাদের দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এখন উগ্রপন্থীরা তাঁদের অফিসই আক্রমণ করছে।"

রাজ্য পুলিশের আই জি (আইন-শৃঙ্খলা) চয়ন মুখোপাধ্যায় জানান, "এই ঘটনায় ৬ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর। সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। চার-পাঁচ জন দুষ্কৃতী সিপিএমের জোনাল অফিসে ঢুকে গুলি চালায়। এটা কেএলও জঙ্গিদের কাজ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।"

বুঝতেই পারছেন নিজস্ব সংবাদদাতার কাজের জায়গা জলপাইগুড়ি জেলার সদর। ধূপগুড়ি স্থানটা সেখান থেকে বেশ দূরে। সন্ধ্যায় এই হামলা ঘটেছে ধূপগুড়িতে। সে খবর জলপাইগুড়ি পৌঁছতে খানিকটা সময় লেগেছে। তারও পরে সংবাদদাতা এই খবর জেনেছেন। ফলে তাঁকে প্রচণ্ড তাড়াহুড়ার মধ্যে বিশদ

বিবরণ যোগাড় করে সরাসরি বা শিলিগুড়ি আঞ্চলিক দফতরের মাধ্যমে কলকাতায় পাঠাতে হয়েছে। ফলে কপিতে কিছু দুর্বলতা থেকে গেছে। সাব-এডিটরের উচিত ছিল এত বড় খবরটি মন দিয়ে সম্পাদনা করে আরও চোখা করে তোলা।

একবার ভেবে দেখুন তো খবরের মুখবন্ধে "শহরের কেন্দ্রস্থলে" শব্দ দুটি জুড়ে দেওয়া দরকার ছিল কিনা। ছিল না। কপিটি ভালভাবে সম্পাদনা করলে কেমন হত তা মূল কপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন—

শনিবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি শহরে সিপিএমের জোনাল কমিটির দপ্তরে সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিবর্ষণ। গুলিবিদ্ধ হয়ে কমপক্ষে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু। গুরুতর আহত ১৩ জন। পুলিশ এবং সিপিএম নেতারা জানিয়েছেন, হামলাকারীরা কেএলও জঙ্গি।

সিপিএমের এই অফিসটি ধূপগুড়ি বাজারের মধ্যে অবস্থিত। লোডশেডিংয়ের মধ্যে এই হামলা ঘটে। হামলাকারীরা গুলি চালাবার আগে জানতে চায় বনমালী রায় অফিসে আছেন কিনা। তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং দলের প্রথম সারির জেলা নেতা।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গোপাল চাকি অন্যতম। এই আক্রমণের সময় তিনি আরও অনেকের সঙ্গে দফতরে বসে একটি বৈঠকে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী হামলাকারীরা সংখ্যায় ছিল ৭ জন। তারা স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রথেকে গুলিবর্ষণ করতে করতে পার্টি অফিসের দোলতায় উঠে যায়।

তিনটি মোটর সাইকেলে ৬ জন জঙ্গি পার্টি অফিসের সামনে আসে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, দলের আর একজন সদস্য এসেছিল পায়ে হেঁটে। পাঁচ মিনিটের হামলায় চারজনকে হত্যা করে হামলাকারীরা মেঠো পথ ধরে পালায়।"

এরপর মূল কপির বাকি অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত করলে তা অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় হত না। কিন্তু মূল কপিতে তথ্য সাজানোর অগ্রাধিকার স্থির করায় গলদ ছিল। পুনর্লিখিত কপিতে তা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। সেই কাজটি সংবাদদাতা নিজেই করলে সব থেকে ভাল হত।

আপনি স্টাফ রিপোর্টারই হোন বা সংবাদদাতাই হোন, আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, রিপোর্ট আর রম্যরচনা, রিপোর্ট আর সাহিত্য এক নয়। সম্পূর্ণ আলাদা। রিপোর্টে শুধুই প্রয়োজনীয় কথা থাকবে। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা লিখে পাণ্ডিত্য জাহির করার সুযোগ রিপোর্টার ও সংবাদদাতার থাকে না।

এই মৌলিক নিয়মটি কোন কোন রিপোর্টার জানেন না বা মানেন না। তাই আমরা দেখি তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনা নিয়ে ম্যাকিনশের অনুসন্ধান সম্পর্কে 'ঠ' কাগজে ২০-৬-২০০২ তারিখে প্রকাশিত রিপোর্ট আরম্ভ করা হয়েছে এইভাবে—

"There is a Chinese proverb that says a journey of a thousand miles, begins but with one small steps."

আসল বিষয়টি এর পর আপনাদের জানাচ্ছি। তা থেকে আপনারা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবেন ওপর কথাগুলি ফালতু লেখা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে রিপোর্টার অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য জাহির করে রিপোর্টটি মাটি করেছেন। ওই রিপোর্টের সারবস্তুটি হল—

"West Bengal has the potential to capture almost a 15% share of the domestic IT market by 2010" state industries minister Nirupam Sen told reporters quoting from the McKinsey report, after a meeting of the state advisory board of industries.

এটি জানার পর আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন ওই রিপোর্টের মুখবন্ধে চিনা প্রবাদকে টেনে আনার কোন দরকার ও সুযোগ ছিল না।

একই রকম অপকর্মের আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এই খবরটি ২০-৮-২০০২ তারিখে 'এ' কাগজে ছাপা হয়েছিল—

ছিল রুমাল, হয়ে গেল বিড়াল

পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার চন্দ্রকোণা রোডে প্রায় চার একর বাস্তু জমির মালিকানা ছিল বনেদি সেন-পরিবারের। রাজনৈতিক চাপে, প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতায় সেই বিপুল পরিমাণ জমির মালিকানা পেয়ে গেল স্থানীয় 'স্টেশনপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব'। ওই জমির অন্যতম স্বত্বাধিকারী দীপঙ্কর সেন পিতৃপুরুষের জমি উদ্ধারের জন্য স্থানীয় সি পি এম নেতা দীপক সরকার, অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে জেলার ডাকাবুকো মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ থেকে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু থেকে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পর্যন্ত রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে দরবার করেছেন। গিয়েছেন জেলাশাসক এম বি রাও এবং জেলার পদস্থ ভূমিসংস্কার আধিকারিকদের কাছে। মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ যে গোটা বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তা জানিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে, দীপঙ্করবাবু হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন বিশ্বখ্যাত সেতারি রবিশঙ্কর কিংবা জনপ্রিয়তম লেখক বুদ্ধদেব গুহ বা সংগীতবিদ কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বরা। বিমান বসু সুশান্ত ঘোষকে বিষয়টি 'দেখতে' বলেছেন। আর সুশান্ত দীপঙ্করবাবুকে জানিয়েছেন 'বিমানদা তো আপনাকে আইনের পথে যেতে বলেছেন। আপনি সে রাস্তায় যান।' দীপঙ্কর বাবুর প্রশ্ন, 'আইনকে বেআইন দিয়ে ঘিরে ফেলে এখন আমাকে বেআইনের বিরুদ্ধে আইনি পথ দেখানো হচ্ছে। বামফ্রন্ট যে 'যুগান্তকারী' ভূমিসংস্কারের কথা বলে ঢাকঢোল পিটিয়ে, এই কি তার নমুনা?'

মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ অবশ্য বিষয়টিকে একেবারেই আমল দেননি। তিনি বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে যে জমি খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই জমির নানা বেআইনি দলিল বিলি করে সেনারা লাখ-লাখ টাকা রোজগার করেছেন। বারবার আদালত এবং ট্রাইবুনাল তাঁদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। সর্বোপরি, এলাকার মানুষ তাঁদের বিরুদ্ধে। তাঁদের সঙ্গে কথা বললেই সব বুঝতে পারবেন। সেন-পরিবান দেড় একর জমি থানার জন্য দান করে বাকি জমি অধিকার করতে চেয়েছিল। সাধারণ মানুষ তা রুখে দিয়েছে।'

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা গড়বেতা, এলাকা চন্দ্রকোণা রোড, মৌজা সারবেড়া, জে এল নং ৪৬৬, খতিয়ান নং ২৮ এবং ২০৯-এর অধীনে চারটি হাল দাগ সংখ্যায় (১১৯/৩৪৫, ১১৯/৩৪৮, ১১৯/৩৪৭, ১১৯/৩৪৬) মোট জমির পরিমাণ ৩.৮৮ একর। এই বিপুল পরিমাণ জমির আনুমানিক দাম প্রায় দেড় কোটি টাকা। অঞ্চলের বনেদি জমিদার সেন-পরিবার এই জমি থেকে দেড় একর জমি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ডিরেকটরেটকে মাত্র এক টাকার বিনিময়ে অঞ্চলে একটি সম্পূর্ণ থানা এবং পুলিশ আবাসনের জন্য ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দান করার প্রস্তাব করে। নিকটবর্তী গড়বেতা থানার দূরত্ব প্রায় ১২ কিলোমিটার। ফলে চন্দ্রকোণা রোডে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা খুবই করুণ। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রুখতে মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে অঞ্চলে একটি সর্বদলীয় 'নাগরিক মঞ্চ' তৈরি হয়েছে। এ-বছরের পুলিশ বাজেটে চন্দ্রকোণা রোডে থানা গড়ার কথা বলা হয়। স্বভাবতই পুলিশ ডিরেকটরেট গত বছরের ১৬ এপ্রিল সেনদের জমি-দান গ্রহণ করতে সম্মত হয় লিখিতভাবে। পুলিশ প্রশাসন জেলা ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিকের কাছে জমির বিস্তৃত বিবরণ জানতে চেয়ে চিঠি লেখে গত বছরের ১৫ জুন। আজ পর্যন্ত সেই চিঠির কোনও জবাব না দিলেও ১২ জুলাই জেলা ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক সংশ্লিষ্ট ব্লক আধিকারিককে নির্দেশ দেন ওই জমির মালিকানা স্থানীয় 'স্টেশন পাড়া স্পোর্টিং ক্লাব'-এর নামে পরিবর্তিত করতে। ২০ জুলাই সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস থেকে সেনদের পৈতৃক বাড়ির দেওয়ালে শুনানির জন্য সমন ঝুলিয়ে দিয়ে আসে সরকারি কর্মীরা। জমির এক শরিক আইনজীবী-সহ ২৩ জুলাই সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে সকাল সাড়ে দশটা থেকে বেলা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত উপস্থিত থাকলেও, সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসার বিকেল পাঁচটার পর একতরফা শুনানি করে বেলাবেলি জমির মালিকানা পাল্টে দেন।

সি পি এম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ইতমধ্যেই প্রায় চার একর জমিকে 'খেলার মাঠ' হিসেবে দাবি করছে। এ-ব্যাপারে সকলেই এককাট্টা। কিন্তু, এ-ক্ষেত্রে দীপঙ্করবাবুর সাফ জবাব, 'চার একর জমিতে বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা হয় না। এখানে খেলার মাঠের কোনও চিহ্ন, গোলপোস্ট ইত্যাদি কখনও ছিল না। যদি খোলা মাঠে কেউ খেলেও, তাতে মাঠটা তাদের হয়ে যায় না। গড়রে মাঠে যুগ-যুগ ধরে খেলাধূলো হয়, তাতেও জমির মালিকানা ফৌজিদেরই থাকে। তা ছাড়া, 'এলাকার উন্নতির' কথা কেবল রাজনৈতিক দলগুলিই ভাবে, তা নয়। আমরাও ভাবি। সেজন্য বিভিন্ন সময়ে এলাকায় একমাত্র হাইস্কুল (ছাত্রাবাস-সহ), বালিকা বিদ্যালয় ও দুটি ফুটবল মাঠের জন্য আমাদের পরিবার জমি দান করেছে। সর্বোপরি, যে-ক্লাবের নামে জমির মালিকানা পাল্টে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসার, তারা নিজেরাই ২০০০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ওই জমিতে দুর্গাপুজোর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব করার অনুমতি চেয়েছিল আমার কাছে। অন্য দিকে পুলিশ প্রশাসনও জমিতে একটি বোর্ড লাগিয়ে নিজেদের আধিপত্য জানিয়েছিল। পরে অবশ্য কে বা কারা তা উপড়ে ফেলে।' দীপঙ্করবাবুর খেদ, 'আমি জানি না, মেঘের আড়ালে থেকে কোন ইন্দ্রজৎ খেলাটা খেলছেন! তিনি কতবড় যোদ্ধা যে তাঁর প্রভাবের রাজ্যের 'পরিচ্ছন্ন ও জনদরদী' সরকার সাধারণ মানুষের জন্য নিবেদিত দেড় কোটি টাকার দানও তুচ্ছ করতে পারে!'

ওই রিপোর্টটির মুখবন্ধের প্রথম বাক্য "ছিল রুমাল, হয়ে গেল বিড়াল" লিখে সংবাদদাতা পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেননি, নিজের কাজ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। আপনারা কেউ যেন এভাবে খবর লেখার জন্য প্ররোচিত হবেন না।

লক্ষ্য করুন, খবরে মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষকে 'ডাকাবুকো' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন মন্ত্রীকে এমনভাবে বর্ণনা করবেন না।

খবরে লেখা হয়েছে, মন্ত্রী "গোটা বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত"। 'গোটা' এবং 'সম্পূর্ণ' কথা দুটি লেখার কোন দরকার ছিল না। মন্ত্রী "বিষয়টি জানেন" লিখলেই পাঠক ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন।

এই রকম আরও কিছু অনাচারের দৃষ্টান্ত এই খবরে রয়েছে। তা ছাড়া খবরটি ছোট আকারে লেখা যায়। এই খবরের গুরুত্ব থানা তৈরির জমি বেদখলে। সেন পরিবারের স্বার্থ বড় করে দেখে ও বোঝাতে গিয়ে সেই আসল ঘটনাটিই চাপা পড়ে গেছে।

হাতের পাঁচটা আঙুল যেমন সমান নয়, তেমনি সব রিপোর্টার-এরও যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার বিচার সমান হয় না। তাঁদের সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) হুকুম পেলেই যে কোন বিষয়ে, যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে খবরের সন্ধানে ছুটে যান রিপোর্টার। নির্দিষ্ট কাজ না পেলে তাঁরা বসে থাকেন না বা আড্ডা মারেন না। নিজের গরজে খবর খুঁজে বেড়ান। এই রকম রিপোর্টার কাগজের সম্পদ।

(খ) যে রিপোর্টাররা নির্দিষ্ট কাজের বা গিঠের বাইরে কাজ করতে চান না, তাঁরা মধ্যম মানের রিপোর্টার।

(গ) আর বাকিরা রিপোর্টার হয়েছেন কিন্তু উপহার উপঢৌকন সংগ্রহ এবং পানভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা ছাড়া কোন কষ্টসাধ্য কাজে উৎসাহ পান না, তারা অধম রিপোর্টার।

উত্তম রিপোর্টারের টেলিফোনের ডায়েরি সব সময় পকেটে থাকে। তাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর লেখা থাকে। কোন নম্বর বদল হলে তিনি তা নিজের ডায়েরিতে সংশোধন করে নেন। সেই ডায়েরি তিনি কখনও বেহাত করেন না, এমনকি ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকেও দেখান না।

উত্তম রিপোর্টার ফ্রি পাস বা কমপ্লিমেন্টারি টিকিট যোগাড় করার জন্য ছোঁক ছোঁক করেন না। উত্তম রিপোর্টারের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য প্রত্যেক দিনের কাগজের প্রথম পাতায় স্থান আদায় করে নেওয়া।

উত্তর রিপোর্টার সরকারি পরিচয়পত্র বা প্রেস কার্ডের অপব্যবহার করেন না। তিনি কখনও ভোলেন না যে প্রেস কার্ড আত্মরক্ষার ঢাল নয়। প্রেস কার্ড একটি পবিত্র নথি। প্রেস কার্ড তার প্রতি কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের বিশ্বাসের অভিজ্ঞান।

নিরাপত্তার কারণে সংরক্ষিত এলাকায় পেশাগত কাজে তাঁর প্রবেশের ছাড়পত্র প্রেস কার্ড। পুলিশের ব্যারিকেড বা গুলি বিনিময়ের উত্তপ্ত ও বিপজ্জনক অঞ্চলে তাঁর অবস্থানের অনুমতিপত্র এই প্রেস কার্ড।

প্রেস কার্ড আছে বলে উত্তম রিপোর্টার কখনও আইনের সীমা অতিক্রম করেন না। উত্তম রিপোর্টার ভুলেও নিজেকে ধর্মের ষাঁড় ভেবে তাঁর পবিত্র পেশার অমর্যাদা করেন না। আর, উত্তম রিপোর্টার কখনও সজ্ঞানে মিথ্যা লিখে কাউকে প্রতারণা করেন না।

কোন রিপোর্টারের পক্ষে মিথ্যা লেখা পাপ। এ কাজ পেশাগত নৈতিকতার বিরোধী। তার মানে কী এই যে, রিপোর্টার পুরো সত্য ছাড়া কিছু লিখবেন না?

পুরো সত্য লেখা রিপোর্টারের কাজ নয়, তাঁর পক্ষে তা সম্ভবও নয়। ধরুন, একজন জননেতা ব্রিগেড

প্যারেড গ্রাউন্ডের মঞ্চ থেকে এক ঘণ্টা ধরে ভাষণ দিলেন। সত্য লিখতে গেলে তাঁর ভাষণের পুরোটাই লিখতে হয়। কিন্তু কাগজে তার জায়গা কোথায়? তার প্রয়োজনীয়তাই বা কী? পাঠক কী দু'পাতা জোড়া দীর্ঘ ভাষণের পূর্ণ বিবরণ কোন দিন পড়ে দেখেন?

তা হলে রিপোর্টার ওই ভাষণের কতটুকু লিখবেন? ওই ভাষণের যে সব অংশ জনসাধারণের জানা দরকার বলে রিপোর্টারের মনে হবে তিনিই সেই নির্বাচিত অংশটুকুই লিখবেন। কিন্তু সেই নির্বাচিত অংশটুকু যেন সত্য হয়, তাতে যেন মিথ্যার খাদ না মেশে। নির্বাচিত অংশটুকু যেন বিকৃত করে লেখা না হয়। এইভাবে খবর লিখলেই রিপোর্টার পেশাগত সততা রক্ষা করতে পারবেন।

এই বিষয়ে ওয়াল্টার লিপম্যানের কিছু কথা উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ সালে তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"..... news and truth are not the same thing, and must be clearly distinguished. The function of news is to signalise an event, the function of truth is to bring to light the hidden facts, to set them into relation with each other, and make a picture of reality on which men can act."

তা সত্ত্বেও সজ্ঞানে মিথ্যা লিখে নিজের, কাগজের ও পেশার মুখে চুনকালি দেবার দৃষ্টান্ত আছে।

১৯৮০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন পোস্টে একটি খবর প্রকাশিত হল। খবরটির শিরোনাম 'জিমির জগৎ' (Jimmy's World)। এই খবরে রিপোর্টার মিস জেনেট কুক (Janet Cooke) জানালেন, জিমি নামে একটি বালককে হেরোইনের নেশায় পোক্ত করে তুলছে তার মায়ের বন্ধু। জিমির স্বপ্ন বড় হয়ে মাদকের ব্যবসায় নেমে পড়া। ব্যবসা করতে গেলে হিসাবপত্র জানতে হবে। তাই সে শুধু অঙ্ক শিখতে স্কুলে যায়। অন্য কোন বিষয় তার ভাল লাগেনা। আর হ্যাঁ, হেরোইনের ইঞ্জেকশান নিতে তার মজাই লাগে।

এই খবরে আমেরিকা তোলপাড়। মেয়র ব্যতিব্যস্ত। পুলিশের ঘুম নেই। পোস্টের কর্তাব্যক্তিদের কাছে পাঠকদের চিঠির স্রোত, জিমিকে উচ্ছন্নে যেতে দেবেন না। ওকে বাঁচান।

কিন্তু কোথায় জিমি। সারা ওয়াশিংটনে চিরুনি তল্লাসি চালিয়ে জিমিকে পাওয়া গেল না।

তার ছ'মাস পরে শ্রেষ্ঠ রিপোর্টের জন্য জেনেট কুককে পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়ার জন্য মনোনীত করা হল। কিন্তু কয়েকদিন পরে প্রমাণ পাওয়া গেল মিস কুক নিজের সম্পর্কে অসত্য বিবরণ দাখিল করেছেন। তা করতে গিয়ে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর লেখা 'জিমির জগৎ' ভিত্তিহীন ব্যাপার। জিমি নামে সেই মাদকাসক্ত বালকের কোন অস্তিত্বই নেই। ফলে মিস কুকের চাকরি গেল।

এ সব ঘটনার এক বছর পরে জাতীয় টেলিভিশনে এক অনুষ্ঠানে ফিল ডোনাহুর (Phil Donahue) প্রশ্নের জবাবে মিস কুক স্বীকার করলেন, জিমির খবরে ছিটেফোঁটা সত্য নেই। খবটাই মনগড়া।

তিনি কেন এ কাজ করেছিলেন?

মিস কুক জানালেন, চমকপ্রদ, চাঞ্চল্যকর, সাড়া জাগানো খবরের তাগাদায় দিশাহারা হয়ে তিনি 'জিমির জগৎ' সৃষ্টি করেছিলেন। জেনেট কুকের জিমির জগৎ প্রকাশিত হয়েছিল ওয়াশিংটন পোস্টের মেট্রোপলিটান বিভাগে। তখন সেই বিভাগের সম্পাদক ছিলেন বব উডওয়ার্ড কার্ল বার্নস্টাইনের সঙ্গে বব ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ফাঁস করেছিলেন। তার প্রতিক্রিয়ায় রিচার্ড নিক্সনকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিতে হয়েছিল।

এই চাঞ্চল্যকর দুনিয়া কাঁপানো খবর তাঁরা যখন ফাঁস করেছিলেন, তখন তাঁরা ছিলেন অতি সাধারণ রিপোর্টার। একটি আপাততুচ্ছ খবরের পিছনে ধৈর্য ধরে লেগে থাকলে কত বড় ঘটনা ঘটতে পারে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি তার প্রমাণ।

প্রথম খবর ছিল, ওয়াশিংটন শহরে ওয়াটারগেট আবাসনে ডেমোক্রাটিক ন্যাশনাল কমিটির দপ্তরে সিঁধ কেটে চুরির চেষ্টা হয়েছিল। সেই অপকর্ম করার সময় পাঁচজন লোক ধরা পড়েছে। দিনটি ছিল শনিবার, তারিখ ১৭ জুন, ১৯৭২। সময় রাত আড়াইটা। ফলে শনিবার সকালের কাগজে এই চুরির কোন খবর ছিল না। ওয়াশিংটন পোস্টের ৩৫ বছরের পোড় খাওয়া পুলিশ বিটের রিপোর্টার আলফ্রেড ই লিউইস (Alfred Ed. Lewis) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই খবরের পিছনে লেগে গেল।

লিউইস পাকা রিপোর্টার ছিল কিন্তু লেখক ছিল কুব কাঁচা। ৩৫ বছর রিপোর্টারির জীবনে তিনি বরাবর টেলিফোনে খবর দিয়ে কাজ বজায় রেখে গেছেন। ১৭ই জুনও তিনি তাই করলেন।

লিউইস দফতরে জানালেন, চোরেরা সবাই ধোপদুরস্ত পোশাক পরিহিত। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রচুর টাকা ছিল— সবই ১০০ ডলারের নোট। তাদের হেপাজত থেকে, ক্যামেরা এবং আড়িপাতার যন্ত্র পাওয়া গেছে।

উইক এন্ডে এই রকম একটা খবর চট করে মেলে না। সুতরাং মোট আটজন রিপোর্টার খবরটার বিশদ বিবরণ যোগাড় করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে নবীনতম দুই রিপোর্টার হলেন উডওয়ার্ড এবং বার্নস্টাইন।

উডওয়ার্ড আদালতে গিয়ে খবর পেলেন, ধৃতদের মধ্যে একজন সি আই এ'র প্রাক্তন কর্মী। বার্নস্টাইন খবর আনলেন, বাকি চারজনেরও সি আই এ'র সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

মাসের পর মাস এই খবরের পিছু ধাওয়া করতে করতে জানা গেল, পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে হোয়াইট হাউসের মদতে এবং রাষ্ট্রপতি নিক্সনের জ্ঞাতসারে। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতিপক্ষের নেতাদের গোপনে কথাবার্তা আড়ি পেতে শোনা। এই খবরেরই শেষ পরিণতি নিক্সনের ইস্তফা।

এবার আমরা পেন্টাগন পেপার্স সম্পর্কে জানব। কারণ, রিপোর্টারের স্বআরোপিত আচরণবিধির একটা হল মিথ্যা খবর না লেখা।

কিন্তু প্রশ্ন হল, খবরের তথ্য যোগাড় করার জন্য রিপোর্টার সব কিছু করতে পারেন? এ বিষয়ে একটা মত হল, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা জনবিরোধী কাজ করে তা গোপন করার চেষ্টা করল তা ফাঁস করতে রিপোর্টার সব কিছু, এমন কী চুরি পর্যন্ত করতে পারেন।

পেন্টাগন পেপার্স বা ম্যাকনামারা পেপার্স ফাঁস করার ড্যান এলসবার্গের (Daniel Ellsberg) সাহায্যে এই কাজই করেছিলেন নিল সেহান (Neil Sheehan)। নিউইয়র্ক টাইমসে পেন্টাগন পেপার্স ফাঁস করার সময় তিনি ছিলেন একজন ফ্রি লান্স রিপোর্টার।

রিপোর্টার হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন তা আপনাদের কাছে শিক্ষণীয় হবে। স্যালিসবেরি জানাচ্ছেন —As a reporter he (Neil Sheehan) possessed limitless energy and doggedness. No detail was too small to resist his curiosity. অর্থাৎ রিপোর্টার হিসাবে নিল সেহান ছিলেন অসীম প্রাণশক্তির অধিকারী। সেই সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড জেদ। তাঁর কৌতূহলের কাছে কোন তথ্যই তুচ্ছ করার ব্যাপার ছিলনা।

এই সব গুণাবলীর অধিকারী সেহান সস্ত্রীক ম্যাসাচুসেটস শহরের একটি হোটেলে নাম ভাঁড়িয়ে ওঠেন। স্যালিসবেরি লিখছেন, They had come to steal the Pentagon Papers.

পেন্টাগনের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণের কাজে জড়িত ড্যান এলসবার্গ সেই সব সরকারি কাগজপত্র সেহানকে দেন। সেগুলি ম্যাসাচুসেটস শহরের এক জেরক্স সেন্টারে সার রাত ধরে কপি করা হয়। তার খরচ পড়ে ১৫০০ ডলার।

এইভাবে সংগৃহীত কাগজপত্রে দেখা যায়, আমেরিকার সরকার ভিয়েতনামে অনেক আগে থেকেই প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তারা সে কথা কখনও স্বীকার না করে চেপে গেছে। এই খবরই ফাঁস করা হয় ম্যাকনামারা পেপার্স বা পেন্টাগন পেপার্স নামের রিপোর্টে।

৫.২.১১ স্তম্ভকার

খবরের কাগজে স্তম্ভকারের বিশেষ ভূমিকা ও মর্যাদা আছে। ইংরেজি ভাষায় স্তম্ভকারকে বলা হয় Columnist। আমরা Columnist কেই বাংলায় স্তম্ভকার বলছি।

স্তম্ভকার কাগজের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক বা বিশেষ সংবাদদাতা নন। সম্পাদক চাইলে যে কোন স্থায়ী সাংবাদিককে দিয়ে স্তম্ভকারের কাজ করাতে পারেন। আবার কাগজের বাইরের কোন বুদ্ধিজীবী বা মুক্ত বিহঙ্গ (Free Lance) সাংবাদিককে দিয়েও স্তম্ভকারের কাজ করাতে পারেন। খবরের কাগজে এই দু'রকম পদ্ধতিই চালু রয়েছে।

এবার আমরা জানব স্তম্ভকার কী কাজ করেন?

তাঁর কাজ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে খবর বিশ্লেষণ করা। কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধই প্রকাশিত হয়। সেই সব নিবন্ধে প্রকাশিত বক্তব্য সেই কাগজের বক্তব্য বলে স্বীকৃত হয়। স্তম্ভকারের বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধের বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত মত বলে বিবেচিত হয়।

স্তম্ভকারের লেখা তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তা, কল্পনা, অনুমান, ধ্যানধারণার ফল। তার সঙ্গে একই বিষয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রকাশিত বক্তব্যের মিল থাকতে পারে, নাও পারে। সম্পাদক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্তের সমর্থনে কলম ধরতে পারেন। স্তম্ভকার তাঁর লেখায় ওই সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করতে পারেন। সেই স্বাধীনতা তাঁকে দিতে হয়।

এই স্বাধীনতার মর্যাদা দিতে হলে স্তম্ভকারকে সব রকম মতাদর্শের বাইরে থাকতে হয়। মন খোলা না থাকলে স্তম্ভকার কখনও সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করতে পারবেন না।

স্তম্ভকারের কাজ সংবাদ বিশ্লেষণ করা, যুদ্ধ করা নয়। কলম লেখক সরকার বা বিরোধী কোন পক্ষেরই বাজনদার নন। সরকার পক্ষের কোন সিদ্ধান্ত, কাজ বা বক্তব্য রাষ্ট্র, সমাজ বা জগণের পক্ষে মঙ্গলজনক বলে মনে না হলে তার কারণ ব্যাখ্যা করা তাঁর ধর্ম। একইভাবে বিরোধী পক্ষের কোন সিদ্ধান্ত, কাজ বা বক্তব্য রাষ্ট্র, সমাজ বা জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর হলে সে কথাও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা কর তাঁর কর্তব্য। তিনি এই নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারলে তাঁর কলম দলমত নির্বিশেষে জনসাধারণের কাছে সমান আদর না পাক, গুরুত্ব পায়। এর অন্যথা হলে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে বলে পাঠকদের মনে ধারণা জন্মে গেলে কলমের সর্বনাশ হয়।

তাঁকে লেখার সময় মনে রাখতে হয়, তিনি সমাজ ও জনগণের সেবক। তাঁদের স্বার্থের চিরজাগ্রত ও সাহসী এক প্রহরী। সরকার বা তার বিরোধী কোন পক্ষের নিন্দা বা প্রশংসার পরোয়া না করে তিনি কলম ছোটান। তিনি সরকার বা বিরোধী কোন পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চান না। তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের বিরোধী নন। তিনি নিজে কোন প্রতিষ্ঠান হতে চান না।

লেখার মধ্যে দিয়ই তাঁকে এই সব ব্যাপার প্রমাণ করতে হয় লেখার মধ্যে দিয়েই তাঁকে প্রমাণ করতে হয় তিনি ব্যক্তিনিরপেক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতিনিরপেক্ষ, দলনিরপেক্ষ, মতাদর্শ নিরপেক্ষ। দেশ, সমাজ ও জনগণের পক্ষে যা কিছু ভাল স্তম্ভকার তার পক্ষে, যা কিছু মন্দ স্তম্ভকার তার বিপক্ষে।

স্তম্ভকার জনগণের স্বার্থের রক্ষক। এ কথার মানে কী? জনগণের ৫১ শতাংশ যদি ভুল করে, মন্দকে ভাল বলে গ্রহণ করে, ভালকে মন্দ ভেবে বর্জন করে বা আঘাত করে কী করবেন স্তম্ভকার? উত্তর খুবই সহজ। স্তম্ভকারের কলম বলিষ্ঠভাবে দেখিয়ে দেবে, জনগণ ভুল করছেন, নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছেন, নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছেন।

মাটির ওপরে, জলের ওপরে, দেওয়ালের এ পিঠে, দিগন্তের এ পারে যা ঘটছে তা লেখা রিপোর্টারের কাজ। মাটির তলায় কী ঘটতে পারে, জলের গভীরে কী ঘটতে চলেছে, দেওয়ালের ও পিঠের রঙ কী, দিগন্তের ও পারে কী অঘটনের প্রস্তুতি চলেছে তা দেখিয়ে দেওয়া স্তম্ভকারের কাজ। সে সব কাজ তিনি কী করে করবেন? তিনি কী গণৎকার? তিনি কি স্ফটিক গোলকের মধ্যে জগৎসংসারের ভবিষ্যৎ দেখতে পান?

সে সব কিছুই নয়। স্ফটিক গোলক নয়, স্তম্ভকারের সম্পদ তাঁর দূরদৃষ্টি, তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা, তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর দার্শনিক মন। এইসব বিরল গুণ ব্যবহার করে ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে একজন সফল স্তম্ভকার বলে পাঠকদের কাছে গৃহীত হবেন। তবেই তাঁর লেখা পাঠকদের মনে দাগ কাটবে, সরকারকে ভাবাবে, বিরোধীদের চিন্তায় ফেলবে।

আর তা না হলে? অকাট্য যুক্তির বদলে কিছু কড়া কড়া কথা, কিছু নিন্দা, কিছু গালিগালাজ দিয়ে মনের ঝাল ঝাড়ছে সকালের স্তম্ভ বিকালের মধ্যেই পাঠকের মত থেকে মুছে যাবে।

খবরের শিরোনাম এবং স্তম্ভের শিরোনাম ভিন্নধর্মী। খবরের শিরোনাম হবে সোজাসাপট। শিরোনামই সংক্ষেপে মূল খবরটা পাঠককে জানিয়ে দেবে। স্তম্ভ নিবন্ধের শিরোনাম তেমন হলেতার আকর্ষণ থাকবে না। পাঠক শিরোনাম পড়েই স্তম্ভের বিষয়বস্তু বুঝে ফেললে তা আর নাও পড়তে পারেন। সেইজন্য স্তম্ভ নিবন্ধের শিরোনাম হবে ইঙ্গিতধর্মী।

কয়েকটি শিরোনামের দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি বোঝার সুবিধা হবে। প্রথমে আমরা জে এন সাহানির লেখা কয়েকটি স্তম্ভ নিবন্ধের শিরোনাম উদ্ধৃত করছি (Rogues' Gallery and Indian Politics, 1982)—

Dark clouds over the national sky.
Boulders on the road
Building the nation on dreams
Placing the pawns in place
Period of crisis

জে এন সাহানি ১৯২৬ সালে Hindustan Times-এর সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি সে পদে ইস্তফা দিয়ে বিভিন্ন কাগজে স্তম্ভ নিবন্ধ লিখতেন।

এস নিহাল সিং দীর্ঘকাল The Statesman কাগজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি সেই কাগজে সাপ্তাহিক স্তম্ভ নিবন্ধ লিখতেন। তাঁর লেখা স্তম্ভগুলি এইভাবে তিনি নিজেই ভাগ করেছেন (Indira's India, A Political Notebook)—

Choosing a President
The Split
Living Dangerously
Triumph
Disillusionment & Turmoil
Defeat
The Second Split

এবার আমরা ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lippmann) সম্পর্কে কয়েকটি কথা জানব। তিনি ছিলেন একজন আমেরিকান সাংবাদিক। ১৯১৪ সালের ৭ নভেম্বর The New Republic — দ্য নিউ রিপাবলিক নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় চলতি ঘটনাপ্রবাহের ওপর মন্তব্য লেখার দায়িত্ব পড়ে লিপম্যানের হাতে। তাঁর বয়স তখন মাত্র ২৫ বছর। তখন থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাতে প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের লেখাগুলিকে তাঁর প্রথম যুগের লেখা বলে গণ্য করা হয়।

এই সময়কালে তাঁর লিখিত নিবন্ধগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়— যুদ্ধ ও শান্তি (War and Peace), রাজনীতি (Politics), অস্থিরতা (Unreast) এবং কলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (Arts and other matters)।

আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে সংবাদ এবং স্তম্ভের শিরোনামের ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা। সংবাদের শিরোনাম হবে সোজাসুজি সংবাদের নির্যাস। শিরোনামেই সংবাদকে চেনা যাবে, বোঝা যাবে, পাওয়া যাবে তার পরিচয়। কিন্তু নিবন্ধের শিরোনাম হবে রহস্যমণ্ডিত। শিরোনাম দেখে স্তম্ভের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সামান্য ধারণাও করা যাবে না। কিন্তু সেটি পড়া শেষ হলে পাঠকের মনে হবে এই নিবন্ধের এর থেকে ভাল শিরোনাম আর হতে পারে না। লিপম্যানের প্রথম জীবনের কয়েকটি স্তম্ভের শিরোনাম উদ্ধৃত করলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে—

শক্তি এবং ভাবনা (Force and Ideas), বিশ্বাস করার ইচ্ছা (The Will to Believe), বিশ্বাসের অযোগ্য? (Untrustworthy?), ধর্মঘট কি পরিত্যাগ করা যাবে? (Can the strike be abandoned?) কেলেঙ্কারি (Scandal)।

"শক্তি ও ভাবনা" ছিল লিপম্যানের লেখা প্রথম স্তম্ভ। লেখাটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে। ধ্বংসের বিরুদ্ধে বিকাশের পক্ষে। এই লেখার মধ্যে দিয়ে প্রচারিত তাঁর মূল বার্তাটি ছিল, বিনাশ নয়, সৃষ্টিই আসল জয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, ইতিহাস বিনাশকে যে গুরুত্ব দেয় সৃষ্টিকে তা দেয় না।

এই নিবন্ধে লিপম্যান লিখেছিলেন, বিনাশের যাবতীয় শক্তি সৃষ্টির মূলে রয়েছে মানুষের কল্পনা (Idea)। তাই বিনাশের শক্তিকে পরাস্ত করতে মানুষের কল্পনাকেই কাজে লাগাতে হবে।

এ কথা ঠিকই যে কিছু মানুষ আজও লিপম্যানের এই ভাবনার বিপরীত কাজে তাঁদের প্রতিভার অপচয় করে চলেছেন। কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে, এই নিবন্ধের মধ্যে দিয়ে লিপম্যান যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা আজও অনেক মানুষকে নিরন্তর ভাবিয়ে চলেছে।

এবার তাঁর লেখা আর একটি নিবন্ধের সারমর্ম আমরা আলোচনা করব। নিবন্ধটির বিষয়বস্তু ধর্মঘট। বলা ভাল, ধর্মঘটের অধিকার। সব দেশের মত ভারতের কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকরা চান, ধর্মঘট নিষিদ্ধ হোক। ট্রেড ইউনিয়নগুলি ধর্মঘটের পথ পরিত্যাগ করুক। সরকার ধর্মঘট বেআইনি ঘোষণা করুক, আইন রচনা করে বলে দেওয়া হোক, ধর্মঘট আর শ্রমিক আন্দোলনের পদ্ধতি বলে স্বীকৃত হবে না।

অন্যদিকে মধ্যপন্থী ও বামপন্থী দলগুলির নেতারা ওই বক্তব্যের বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁদের সার্বজনীন দাবি, ধর্মঘট শ্রমিকদের আন্দোলনের ব্রহ্মাস্ত্র। তাঁরা এই অস্ত্র ত্যাগ করবেন না।

তাহলে উভয় পক্ষে মুখোমুখি এস্পার-ওস্পার সংঘাত তো অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংকটকালে একজন স্তম্ভ নিবন্ধকার কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটি বিচার করেন ও তা সমাধানের কি পথ দেখাতে পারেন?

৮২ বছর আগে এই রকম একটি ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে লিপম্যান যা লিখেছিলেন তা আজও বহাল রয়েছে। ওই সময় Elbert H. Gary — এলবার্ট এইচ গ্যারি নামে এক মার্কিন শিল্পপতি শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের প্রধান Samuel Gompers — স্যামুয়েল গোম্পার্স। গোম্পার্স বলেছিলেন, ইউনিয়ন গড়া এবং ধর্মঘট করা শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার। তাঁর দাবি, কোন সামাজিক ব্যবস্থায় (ধর্মঘটে) নিষেধাজ্ঞা জারি করে অনিচ্ছুক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রমিকদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা যাবে না।)

দুই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের এই ঘাত-প্রতিঘাত লিপম্যানকে বিপচিলত করে তুলল। সমস্যাটি বিশ্লেষণ করে তার সমাধানের পথ নির্দেশ করে তিনি দ্য নিউ রিপাবলিক পত্রিকায় ১৯২০ সালের ২১ জানুয়ারি একটি কলম লেখেন। তারই শিরোনাম ছিল, "Can the strike be abandoned?" "ধর্মঘট কি পরিহার করা যাবে? লেখাটি শুরু হয়েছিল এইভাবে—

অনেক বছর আগে একদিন রাত ন'টায় প্যারিসের একটি বিদ্যুৎ কারখানার মজদুররা এক ঘণ্টার জন্য তাঁদের ক্ষমতা জাহির করেছিলেন। সেই এক ঘণ্টা কাল বিদ্যুৎ বিহনে প্যারিসের রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সোবর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহাশয়কে হাতের কেতাব মুড়ে ফেলতে হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণ বন্ধ করতে হয়েছিল। ব্যবসায়ীদের জরুরি বৈঠক থামিয়ে ফেলতে হয়েছিল মধ্যপথে। অন্যান্য কলকারখানার কয়েক হাজার শ্রমিককে যন্ত্র ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল ফাঁকা জায়গায়।

রাত দশটায় বিদ্যুৎ ফিরে এলে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ এই অনাচারকে তুলোধোনা করতে কলম বাগিয়ে বসে গেলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, মুষ্টিমেয় লোকের হক যতই ন্যায্য হোক তা আদায়ের জন্য বড় বড় কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার কোন অধিকার তাদের নেই। বিদ্যুৎ সরবরাহের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের কর্মীদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বিস্মৃত হওয়া খুবই অনৈতিক ব্যাপার। বিদ্যুৎ সরবরাহ ৬০ মিনিট বন্ধ থাকায় যাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছিল তাঁরা সবাই এক বাক্যে ওই সম্পাদকীয় বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে

গেলেন। কিন্তু তাতেও নৈতিকতা বা আইনের দোহাই দিয়ে সংগঠিত শিল্পের কর্মীদের বশ মানাবার অবস্থা তৈরি করা গেল না।

তার ব্যবস্থা করতে গেলে গ্যারিবাদ (Garyism) বহাল করতে হয়। তাতে স্বৈরাচার কায়েম হয়, তাকে অনুসরণ করে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (rebellion)। অন্যটা করতে গেলে গোম্পার্সবাদের (Gomperism) ওপর নির্ভর করতে হয়। গোম্পার্সবাদ কায়েম হলে অত্যাবশ্যক শিল্পের মুষ্টিমেয় কর্মীর স্বেচ্ছাচার যে কোন সময়ে সভ্য জীবনযাত্রা অচল করে দিতে পারে।

এই পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাত থেকে বৃহত্তর জনসাধারণকে রক্ষা করার কোন উপায়ই কি নেই?

লিপম্যান লিখলেন, নিশ্চয় আছে। সেই পথ হল মেহনতী মানুষদের মানসিক অধিকার স্বীকার করে নেওয়া তাদের কাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। তাদের মেহনতের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া। এইসব ব্যবস্থা করার জন্য সাত দফা কর্মসূচি দিলেন লিপম্যান। আর লিখলেন, প্রস্তাবিত কর্মসূচিকে আইনগত মান্যতা দেবার কথা।

এই লেখার মধ্যে দিয়ে শ্রমিক ও মালিক এবং তৃতীয় পক্ষ বৃহত্তর জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য লিপম্যান যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তা জলের মত পরিষ্কার। শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তিতে ত্রিপাক্ষিক উদ্যোগের ব্যবস্থা এই লেখার মধ্যে দিয়েই বিকশিত হয়েছিল বলেই মনে হয় নাকি?

আপনি নিজে লিপম্যানের এই স্তম্ভ নিবন্ধটি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবেন, এতে আবেগের লেশমাত্র নেই, আছে যুক্তির পর যুক্তি। এতে কড়া কড়া কথার কশাঘাত নেই। শূন্যগর্ভ গালিগালাজ নেই, আছে বৃহত্তর জনগণের প্রতি স্তম্ভনিবন্ধ লেখকের দায়বদ্ধতার পরিচয়। মালিকের শোষণ এবং শ্রমিকদের স্বৈরাচার দুই অপশক্তির ক্ষতিকারক দিকগুলি এই নিবন্ধে ফুটিয়ে তুলেছিলেন লিপম্যান।

একজন নিবন্ধলেখকের কতটা দূরদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। তার একটি নজির এখন আপনাদের জানাব। ইটালিতে বেনিটো মুসোলিনি তখন বেশ ভাল করেই মাথা চাড়া দিয়েছেন। মুসোলিনিকে মহামানব (Superman) বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন জর্জ বার্নার্ড শ। গ্রেট ব্রিটেনের গ্রেট লিডাররা মুসোলিনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমেরিকান প্রেসেও মুসেলিনির প্রতি সমর্থনের ফোটারা ছুটছে। ১৯২৫ সালে এই রকম হাওয়ার বিরুদ্ধে কলম ছোটালেন ওয়াল্টার লিপম্যান। দ্য ওয়ার্ল্ড (The World) কাগজে তিনি একটি নিবন্ধে মুসোলিনির মুখোশ খুলে আসল মুখশ্রী জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলেন। তাতে ইটালিতে মুসোলিনির বিরোধীদের জেলে কয়েদ করা এবং খুন করার ঘটনাবলী উল্লেখ করে লিপম্যান লিখলেন, "We do not trust Mussolini because we regard his regime as the supreme menace to the peace of Europe" — আমরা মুখোলিনিকে বিশ্বাস করি না। কারণ, আমরা মনে করি তার শাসন ইউরোপের শান্তির পক্ষে মহা বিপদ।

দীর্ঘ ১৪ বছর পরে লিপম্যানের এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতারা ১৯২৫ সালে মুসোলিনিকে চিনতে ভুল করেছিলেন কিন্তু স্তম্ভলেখক মানুষ চিনতে ভুল করেননি।

ওই নিবন্ধে আমেরিকা, ইউরোপ তথা বিশ্ববাসীকে সাবধান করে দিয়ে লিপম্যান লিখেছিলেন, "The fascist regime in Italy is a dictatorship which has had to become more dictatorial the longer

it has held power" — ইটালির ফ্যাসিস্ট শাসন স্বৈরতন্ত্রী শাসন। এই শাসন যত বেশি দীর্ঘায়িত হবে স্বৈরাচারও ততই বৃদ্ধি পাবে।

সম্পাদকের এই দূরদৃষ্টিও অনেক পরে প্রমাণিত হয়েছিল।

এই বিরল গুণাবলীর জন্যই লিপম্যানকে বলা হয় বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ স্তম্ভকার। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লন্ডনের The Observer কাগজে Alistair Buchanan লিখেছিলেন, "The name that opened every door." Ten Days That Shook The World বইয়ের লেখক ও সাংবাদিক জন রিড (John Reed) ছিলেন লিপম্যানের সহপাঠি। তিনি বলতেন, লিপম্যান ভবিষ্যতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবার যোগ্য।

১৯৩১ সাল থেকে তিনি যে সব স্তম্ভ নিবন্ধ রচনা করেছেন, তার সাধারণ শিরোনাম ছিল Today and Tomorrow। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত নিবন্ধগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন কাগজে একযোগে প্রকাশিত হত।

পাঠকরা লিপম্যানের লেখা নিবন্ধগুলি থেকে সমস্যা সমাধানের পথ যত না খুঁজতেন তার থেকে বেশি খুঁজতেন খবরের পক্ষপাতহীন, আবেগশূন্য যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। লিপম্যান নিজেও সেটা জানতেন। তাই তিনি বলতেন, স্তম্ভকার আন্দোলনকারী নন, স্তম্ভকার ধর্মপ্রচারক নন। স্তম্ভকার জনকল্যাণে কখন রক্ষণশীল, কখন প্রগতিশীল; কখন পুঁজিবাদের সমর্থক, কখন সমাজতন্ত্রের।

আবেগ নয়— বিচারবুদ্ধি, গালিগালাজ নয়— যুক্তি, ব্যঙ্গবিদ্রূপ নয়— সংযম এসবেরই নাম ওয়ল্টার লিপম্যান। স্তম্ভকার হিসাবে তিনি একজন আদ্যন্ত যুক্তিবাদী মানুষ।

১৯৭৪ সালে ৭৫ বছর বয়সে বিংশ শতাব্দীর এই মানবদরদী শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের জীবনাবসান হয়।

বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখা কয়েকটি স্তম্ভনিবন্ধের শিরোনাম উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব—

Life is Cheap
Taking a Chance
Quiet, Please
Devil's Advocates

৫.২.১২ বিষয়বস্তু নির্বাচন

পরের দিনের কাগজে কোন কোন বিষয়ে কি ধরনের খবর, মন্তব্য, স্তম্ভ, ফিচার, অন্যান্য রচনা থাকবে তা ঠিক করা বেশ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আপনারা আগেই জেনেছেন এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকার সম্পাদকের, তার আগে পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধানরা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন।

মালিক যদি নিজেই সম্পাদক হন তো এই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তাঁর তরফে নির্বাহী সম্পাদক। তাঁর সিদ্ধান্ত যতক্ষণ পর্যন্ত মালিক-সম্পাদকের চিন্তা ও স্বার্থের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় ততক্ষণ নির্বাহী সম্পাদক নিরাপদ। তা না হলেই তাঁর বিপদ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিতব্য বিষয়গুলি নির্বাচন করেন সহকারী সম্পাদকবৃন্দ। খবরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন বার্তা সম্পাদক। চিফ সাব এবং চিফ রিপোর্টার এই ব্যাপারে বার্তা সম্পাদককে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

সাধারণভাবে প্রতিদিন কাগজে অনেক রকম ছোট বড়, গুরুত্বপূর্ণ, মামুলি খবর এসে জমা হয়। তার সবগুললি খবরকে একদিনের কাগজে স্থান দেওয়া যায় না। তাই প্রাপ্ত খবরগুলি যত্নের সঙ্গে বাছাই করতে হয়। দেখতে হয়, কোন খবরগুলি পরের দিনের কাগজে ধরাতেই হবে। কোন খবরগুলি সেদিন বা কোন দিন না ধরালেও কাগজের পাঠকদের বঞ্চিত করা হবে না। এই কাজ ভুল হলে এবং বারবার সেই ভুল হতে থাকলে কাগজ ক্রমশ পাঠকদের মন থেকে দূরে সরে যায়। কাগজের বিক্রি পড়তে থাকে। বিজ্ঞাপনদাতারা সেই কাগজ সম্পর্কে আগ্রহ হারায়।

পাঠকরাই কাগজের শক্তির উৎস। সুতরাং তাঁদের চাহিদা কী, তাঁদের কৌতূহল কিসে, কোন বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ বেশি এসব বিষয়ের ওপরই খবরের গুরুত্ব নির্ভর করে। এসব বিষয়ে পাঠকদের মনের কথা যে রিপোর্টার, যে সাব-এডিটর, যে চিফ সাব, যে বার্তা সম্পাদক যত ভাল ভাবে বুঝতে পারেন তাঁর সংবাদ নির্বাচন তত ঠিক হয়।

সাংবাদিকরা নিজেরা কী চান, কী পছন্দ করেন, কী খবর পড়তে চান তার থেকে পাঠকের পছন্দ-অপছন্দের মূল্য অনেক বেশি। কোন সাংবাদিক হয়ত ফুটবল ক্রিকেটকে বাজে ব্যাপার মনে করেন। তাই তিনি বাইচুং, ব্যারেটো, শচীন, সৌরভকে মাঝারি খবরের বেশি স্বীকৃতি দিতে চাননা। কিন্তু তাঁর কাগজের হাজার হাজার পাঠক এই বিষয়ে খুব বেশি উৎসাহী। তাঁদের কথা ভেবে সৌরভ শচীন বাইচুং ব্যারেটোকে প্রথম পাতায় বড় খবরের গুরুত্ব না দিলেই নয়।

আবার কোন সাংবাদিক মনে করতে পারেন সৌরভ শচীন বাইচুং ব্যারেটোই জীবন, বাকি সব ফালতু। কিন্তু হাজার হাজার পাঠক তা না মানতে পারেন। তাঁদের কথা উপেক্ষা করে কাগজের প্রথম পাতায় শুধুই ফুটবল ক্রিকেট, বাকিরা উপেক্ষিত। এমন সিদ্ধান্তের দ্বারা যে সাংবাদিক খবর নির্বাচন করবেন তিনি কাগজের ক্ষতি করবেন।

এই পরস্পরবিরোধী অবস্থা থেকে বোঝা যাচ্ছে, খবর নির্বাচনে বিভিন্ন বিষয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শুধু খেলার খবর, শুধুই রাজনীতির খবর, শুধুই ব্যক্তিপূজা; বাকি সব কিছু আজেবাজে ব্যাপার এরকম ধারণা মনে গেঁথে থাকলে খবর নির্বাচনে ভুল হতে বাধ্য। তাই বিভিন্ন রুচির পাঠকের আগ্রহ সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তিতে ভারসাম্য রক্ষা করে খবর বাছাই করা উচিত।

৫.২.১৩ সংবাদ সংস্কার

চিফ সাব এবং সাব-এডিটরদের কাজের বর্ণনা পড়ে আপনারা নিশ্চয় জেনেছেন খবরাখবর যেমনভাবে লেখা হয় সব ক্ষেত্রে ঠিক তেমনভাবে তা কাগজে ছাপা সম্ভব নয়। খবরগুলি কাগজের প্রয়োজন, অন্য খবরের চাপ, অন্য খবরের গুরুত্ব, বিজ্ঞাপনের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে নির্বাচিত খবরগুলির সংস্কার করে নিতে হয়। হট মেটালের যুগে যে কাজ যারা করতেন কেউ কেউ তাঁদের বলতেন, "Man with a blue pencil", কেউ বা বলতেন, "The man in the green eyeshade"।

এই রহস্যময় মানুষগুলি পাঠকদের কাছে অপরিচিত। তাঁদের কর্মক্ষেত্র বার্তা বিভাগের News Desk — নিউজ ডেস্ক, কেউ কেউ বলেন Copy Desk — কপি ডেস্ক। সংক্ষেপে শুধুই ডেস্ক।

এই সুযোগে আমরা আর একবার Copy এবং Desk কে ভাল করে চিনে নিই। খবরের কাগজে Copy হল— "A term applied to all written material" — অর্থাৎ লিখিত সব বিষয়বস্তুই কপি। আর Copy Desk হল— "The desk, often horseshoe shaped, at which copy is edited. On smaller newspapers, frequently all copies is edited at a single universal desk. On larger papers there are usually several separate copy desks such as the city desk, telegraph desk, and cable desk" — অর্থাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতির যে টেবিলে কপি সম্পাদনা হয় তাকে ডেস্ক বলে। ছোট কাগজগুলিতে একটি বড় টেবিলের ওপর সব রকম খবর সম্পাদনা হয়। বড় কাগজগুলিতে শহরের খবর ও টেলিগ্রাফ যোগে পাওয়া খবর সম্পাদনার জন্য আলাদা আলাদা ডেস্ক থাকে।

খবর সম্পাদনা এক অর্থে খবর পরিমার্জনা বা সংস্কার (Process) করা। কাব্যে উপেক্ষিতা উর্মিলা, আর পাঠকদের কাছে উপেক্ষিত ডেস্কে কর্মরত সাংবাদিকরা। কিন্তু প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের দক্ষতার ওপরই একটি কাগজ ঠিক সময়, নির্ভুলভাবে পাঠকদের হাতে পৌঁছবে কিনা তা নির্ভর করে।

খবর সংস্কারের কাজে গাফিলতি হলে নানা রকম ভুলের সম্ভাবনা থাকে। যথা—

এক বা একাধিক প্রয়োজনীয় খবর বাদ পড়ে যেতে পারে।

তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ খবর বেশি গুরুত্বপূর্ণ খবরের জায়গার খানিকটা কেড়ে নিয়ে তার গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারে।

বানান ভুল থেকে যেতে পারে।

ব্যাকরণ মেনে লেখা না হতে পারে।

বাক্যের গঠন অনাবশ্যক জটিল, বড় এবং অপাঠ্য হয়ে থাকতে পারে।

লিখন পদ্ধতিতে সমতা না থাকতে পারে।

লিখিত বিষয় রুচিসম্মত না হতে পারে।

প্রদত্ত তথ্যে ভুল থাকতে পারে।

এইসব গলদ নিয়ে কাগজ প্রকাশিত হলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও মর্যাদা নষ্ট হয়। ডেস্কের কাজ এই ধরনের গলদ ধরা ও সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সংস্কার করে পরিবেশনযোগ্য করে তোলা। তছাড়া—

রিপোর্টারের মনের মাধুরী খবরে মিশে গেলে তাঁর বস্তুনিষ্ঠতা খর্ব হতে বাধ্য।

অনাবশ্যক বিশদ বিবরণ দিয়ে খবরের ভার বাড়াবার চেষ্টা হলে তার ভার ত বাড়েই না, ধারও নষ্ট হয়।

বাগাড়ম্বর পাঠকের বিরক্তির কারণ হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব থাকলে পাঠকের ন্যায্য কৌতূহলের নিবৃত্তি হয় না।

বেখাপ্পা বর্ণনা পাঠকের হাসির কারণ হয়।

খবরের মধ্যে দিয়ে ছদ্ম বিজ্ঞাপন প্রচারিত হতে পারে।

আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হয়ে কাগজ সমস্যায় পড়তে পারে।

খবরেব নামে গুজব বা জনরব প্রচারিত হতে পারে।

পুরান খবর নতুন মোড়কে চালিয়ে দেওয়া হতে পারে।

একই বক্তব্য, একই তথ্য, একই বিবরণের পুনরাবৃত্তি থেকে যেতে পারে।

এসব গলদ ধরার জন্যই ডেস্ক। ডেস্ক শুধু গলদ ধরেই হাত ধুয়ে ফেলবে না। গলদগুলি ঝেড়ে মুছে, ছাঁটাই করে কপিকে পাতে দেওয়ার যোগ্য করে তুলবে। এ সবই খবর সম্পাদনা বা সংস্কারের অঙ্গ।

রিপোর্টারদের জব্দ করার জন্য বা তাদের অপদার্থ প্রমাণ করা খবর সংস্কারের লক্ষ্য নয়। এ কাজের উদ্দেশ্য কাগজের পাঠক ও গ্রাহককে তুষ্ট করা। তুষ্ট হলে বিজ্ঞাপনদাতারাও তুষ্ট হতে বাধ্য। পাঠক, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতারা যে কাগজের ওপর তুষ্ট সে কাগজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গ্রানাইট পাথরের মত শক্ত।

৫.২.১৪ লিখনপদ্ধতির সমতাবিধান

যে কোন বই বা সাময়িকপত্রের মত খবরের কাগজেও লিখনপদ্ধতির সমতা থাকা অপরিহার্য। এই বিষয়ে ভাষা বিশেষজ্ঞদের মতের ভিত্তিতে নীতি স্থির করবেন সম্পাদক। প্রত্যেক সাংবাদিককে লিখনপদ্ধতির নির্ধারিত রীতি অনুসরণ করতে হবে। তবেই সেই নির্দিষ্ট কাগজে লিখনপদ্ধতির সমতা বিধান সম্ভব হবে।

সম্পাদককে প্রথমে ঠিক করতে হবে তাঁর কাগজের ভাষা কী হবে— সাধু না চলিত? এই প্রশ্ন কেন আসছে সে কথাও আপনাদের জেনে রাখা উচিত। ষাটের দশকেও বাংলা খবরের কাগজগুলিতে সাধুভাষায় যাবতীয় লেখা প্রকাশিত হত। সেটাই ছিল তখনকার রীতি। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৫২ সালের জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সাধুভাষায় লেখা একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করছি—

কাজের পাগল

"অনেকে ভুল করে বলেছে, আমার ৭২ বৎসর হয়েছে; বাহাত্তুরে হলে পাগল হয়ই। আমাকে পাগল বলতে চান, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি বাজে পাগলের দলে নই। আমি নিজেকে কাজের পাগল মনে করতে চাই। আমি প্রতিমুহূর্তে নূতন শক্তি, নূতন চেতনা, নূতন ভাবধারা, নূতন জীবন নিয়ে নিত্যনূতন কাজের মধ্যে জন্ম নিতে চাই; বৎসরে বিশেষ একটি দিনে বিশেষ একটি ক্ষণে নহে।"

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গত মঙ্গলবার সায়াহ্নে কুমার সিং হলে তাঁহার একসপ্ততিতম জন্মদিবসের উৎসব সভায় ভাবোদ্বেলিত কণ্ঠে উপরোক্ত উক্তিতে সম্বর্ধনার উত্তর দেন। বিপুলভাবে পুষ্পমাল্য শোভিত হইয়া সাদা গলাবন্ধ কোট গায়ে ডাঃ রায়কে বিশেষ উৎফুল্ল ও অনুপ্রাণিত মনে হইতেছিল। তিনি মাঝেমধ্যেই তাঁহার বক্তৃতায় কাব্যিকতা ও দার্শনিকতার অবতারণা করেন।

একসপ্ততিতম জন্মদিবসের উৎসব সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বক্তৃতার মাঝপথে কাব্যমুখর হইয়া উঠেন। উপমার সাহায্যে তিনি দার্শনিক কথাও বলেন। যেমন ত্যাগ ও ভোগ দর্শনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পাখীর গান, ফুলের গন্ধ ও চন্দ্রের কিরণের উল্লেখ করেন।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বা শেষ দিক থেকে কলকাতার বাংলা কাগজগুলি একে একে সাধুভাষার বদলে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে চলিতভাষার দখলে চলে গেছে।

এই প্রসঙ্গে রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) বক্তব্য অত্যন্ত মূল্যবান। ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন মাসে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় 'বাংলা ভাষার আধুনিক' রূপ শিরোনামে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি প্রেসক্লাব,

কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত "১৪০১ সংবাদপত্রে শতাব্দী" স্মারক গ্রন্থে পুনপ্রকাশিত হয়েছিল। তার এক জায়গায় রাজশেখর লিখেছিলেন, "সাধুভাষার মানে সভ্যলোকের বা সভ্যলোকের ভাষা নয়। চলিতভাষার মানে প্রচলিত ভাষা নয়। বাংলা ভাষার বিশেষণ হিসাবে সাধু আর চলিত দুটিই রূঢ় শব্দ, দুই ভাষাই লৈখিক বা সাহিত্যিক। সাধা ও চলিতভাষার প্রধান প্রভেদ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের জন্য, যথা— "তাঁহারা বলিলেন" কিংবা "তাঁরা বললেন"।

কারো কারো ধারণা আছে, মুখের ভাষা আর চলিতভাষা একই। এই ধারণা ভ্রান্ত। তা কাটাবার জন্য রাজশেখর ওই প্রবন্ধে লিখেছেন, "লেখবার সময় লোকে যতটা সাবধান হয়, কথাবার্তায় ততটা হত পারে না।"

যথা?

রাজশেখর লিখেছেন, কোন লোক তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতেই পারেন, "গ্যালো রোব্বারে কোথা গেশলে হ্যা?"

এটা হল চলিতভাষার কথ্য রূপ। কিন্তু ওই ব্যক্তিই লেখার সময় সাবধান হয়ে লিখবেন, "গেল রবিবারে কোথা গিয়েছিলে হে?"

চলিতভাষায় লেখা মানে যেমন-তেমন করে লিখে ফেলা নয়। চলিতভাষা লেখার সময়েও তা সাবধানে ও নিয়মরীতি মেনে লিখতে হয়। তার ব্যতিক্রম হলে লেখক ও কাগজ দুইই ঠাট্টা তামাশার খোরাক হয়ে উঠবে। শিক্ষিত পাঠক সেই কাগজের ওপর ক্রমশ শ্রদ্ধা হারাবে।

নিয়ম নীতির কথাই যখন এসে গেল তখন আবার রাজশেখরের বক্তব্য স্মরণ করতে হয়। ওই প্রবন্ধে তিনি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করতে বলেছেন—

ক্রিয়াপদ আর সর্বনামের সাধু রূপের বদলে চলিত রূপ গৃহীত হোক।

যে শব্দের সাধু আর চলিত রূপের ভেদ আদ্য অক্ষরে, তার সাধু রূপই বজায় থাকুক, যথা— "ওপর পেছন পেতল ভেতর" না লিখে "উপর পিছন পিতল ভিতর"।

যার ভেদ মধ্য বা অন্ত্য অক্ষরে, তার চলিত রূপই নেওয়া হোক, যথা— "কুয়া মিছা উঠান একচেটিয়া" স্থানে "কুয়ো মিছে উঠন একচেটে"।

বর্তমান সাধুভাষায় প্রচলিত সমস্ত সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতরূপে রাখা হোক। "সত্য মিথ্যা নূতন অবশ্য শীঘ্র জিজ্ঞাসা" স্থানে "সত্যি মিথ্যে নোতুন অবিশ্যি শীগ্‌গির জিজ্ঞেস" লেখা হবে না।

এখন যে চলিত ভাষা বাংলা খবরের কাগজের অবলম্বন তার পোশাকি নাম মান্য চলিতভাষা। মান্য চলিতের লেখ্য রূপ বাংলা কাগজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লিখনপদ্ধতির সমতাবিধানের কাজ শেষ হয়ে গেল না। বরং তা শুরু হল। থেকে গেল বানানের প্রশ্ন। কোন শব্দের কী বানান লেখা হবে সেই বিষয়টি লিখনপদ্ধতির সমতাবিধানের ক্ষেত্রে অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে।

রাজশেখর ওই প্রবন্ধে বানানের প্রসঙ্গটিও আলোচনা করেছেন। তিনি বানানকে "ভাষার তৃতীয় অঙ্গ" বলে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় অঙ্গটি যদি সর্বত্র একরূপ না হয়ে নানা ক্ষেত্রে নানা রূপে আবির্ভূত হয় তাহলে তা খুবই গোলমেলে হয়ে উঠবে। তা যাতে না হয় তার জন্যই লিখনপদ্ধতিতে সমতবিধান করতে গেলে বানানে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য।

রাজশেখর বলেছেন, সংস্কৃতজাত ভাষায় রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয় না। যেমন— কর্ম লিখতে একটা ম যথেষ্ট, ম্ম দরকার নেই।

ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা না থাকলে অ-সংস্কৃত শব্দের শেষ বর্ণে হস্-চিহ্ন বর্জনীয়, যথা—"ওস্তাদ পকেট হুক ডিমা"। অসংস্কৃত শব্দে ণ থাকবে না। কেবল ন। "আরবী ফারসী ইংরেজি প্রভৃতি বিশেশী শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে বাংলা বানানে S (s) স্থানে স, Sh (sh) স্থানে শ হবে। যথা— জিনিস সরকার ক্লাস নোটিস দন্ত্য স; শরম শুরু শাগরেদ শেমিজ পালিশ তালব্য শ।

নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় বর্জনীয়। War — ওআর, ওয়ার নয়। কিন্তু Wire — ওয়ার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানের কতকগুলি নিয়ম সঙ্কলন করে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। রাজশেখর তাঁর ঐ প্রবন্ধে সে কথা উল্লেখ করেছেন।

তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। রাজশেখরের সময় যা ছিল 'কলিকাতা' এখন তা বাংলা খবরের কাগজে 'কলকাতা'।

রাজশেখর লিখতেন 'আরবী ফারসী ইংরেজী'। এখন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি অনুযায়ী 'আরবি ফারসি ইংরেজি'।

আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি সবাই অনুসরণ করলে লেখনপদ্ধতির সমতাবিধানে বানানের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই একটা সমতা আসবে। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি মেনে নিয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে সেই বিধি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে। তবে পুরান অভ্যাস তো সহজে দূর হয় না।

লিখনপদ্ধতির সমতাবিধানে আরও কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্ট সম্পাদকীয় নীতি থাকা দরকার। যেমন, নীচের বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি তাঁর কাগজে লেখা হবে—

বীরাপ্পন	—	বীরাপ্পান
জঙ্গি	—	জঙ্গী
অ্যাডমিশান টেস্ট	—	প্রবেশিকা পরীক্ষা
অগস্ট	—	আগস্ট
সনিয়া	—	সোনিয়া
গাঁধি	—	গান্ধী
গুজরাট	—	গুজরাত
বাজপেয়ী	—	প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী
আট	—	৮
কুড়ি	—	২০
আইনসভা	—	বিধানসভা
চন্দনদস্যু	—	জঙ্গলদস্যু
ভ্যাকসিন	—	টিকা
শচীন	—	সচিন

এই রকম প্রচুর শব্দ আপনাদের চোখে পড়বে যেগুলির ব্যবহারে নানা অসঙ্গতি রয়েছে। এমনও দেখবেন, একটি কাগজে একদিনের সংখ্যাতেই একজায়গায় বীরাপ্পন আর এক জায়গায় বীরাপ্পান লেখা হয়েছে। কোন কাগজ লেখে অগস্ট, কেউ লেখে আগস্ট, কেউ লেখে সোনিয়া, কেউ লেখে সনিয়া, কেউ লেখে জঙ্গি, কেউ লেখে জঙ্গী।

আকাডেমির বানানবিধিতে জঙ্গী, আগস্ট মান্য নয়। সংখ্যার ক্ষেত্রে ১ থেকে নয় পর্যন্ত শব্দে লেখাই চল, বাকিগুলি সংখ্যায়। আপনারাও এই নিয়ম মেনে চলবেন বলে আশা রাখি।

লিখনপদ্ধতির সমতাবিধান কেন দরকার এই বইয়ে সেই প্রসঙ্গই সংক্ষেপে আলোচনা কর হল। এই ব্যাপারটি বোঝার জন্য অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে মাত্র।

Killed বোঝাতে হত্যা না খুন না খতম, dead বলতে মৃত না নিহত কি লেখা হবে তার নির্দেশ থাকা দরকার।

হাতের কাছে 'খ' কাগজের ১১ আগস্ট ২০০২ সালের সংখ্যাটি রয়েছে। সেটি দেখে মনে হচ্ছে ইংরেজি কথার কতটা বাংলা প্রতিশব্দ খবরে লেখা হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা দরকার। তা না থাকলে লেখার ধাঁচে সমতা আনা শক্ত। যেমন ধরুন—

জর্জ বুশকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট, না আমেরিকার রাষ্ট্রপতি লেখা হবে?

Planning Commission কে যোজনা কমিশন লেখা গেলে MOU — মউকে (Memorandum of Understanding) সমঝোতাপত্র লিখতে বাধা কোথায়? একই খবরে একবার "মউ", আর একবার "সমঝোতা পত্র", আর একবার "মউ বা সমঝোতাপত্র" লেখা হলে বুঝতে হবে লেখার ধাঁচে সমতা আনার ব্যাপারে ওই কাগজের চেষ্টার অভাব আছে।

ওই কাগজে একই দিনে লেখা হয়েছে, "শিল্প খাতে রাজ্যের টার্গেট"— "টার্গেট" কেন? লক্ষ্য কথাটি ওই কাগজের রিপোর্টার বা সাব-এডিটরের জানা থাকলে সেটাই লেখা হত।

লেখার ধাঁচে সমতা আনার চেষ্টা থাকলে কোন কাগজে যথেচ্ছ "হেস্তনেস্ত", "জেহাদ" এই রকম কথা ব্যবহার না করে বর্জন করা হত। "কম" বা "কমতি"কে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে "খামতি" কথাটি জাঁকিয়ে বসতে পারত না।

'খ' কাগজের ওই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি খবরে লেখা হয়েছে, "রেল বিভাজন নিয়ে সোমবারের (১২ আগস্ট, ২০০২) মধ্যে কোন হেস্তনেস্ত না হলে" আরও বড় আন্দোলনের হুমকি। "আন্দোলনের হুমকি খবর হিসাবে বেশ গরম ঠিকই। কিন্তু এখানে "হেস্তনেস্ত" কথাটি খাটবে কি? "হেস্তনেস্ত" কথার মানে তো নিষ্পত্তি। তা রেলওয়ে জোন বিভাজনের বিষয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একাধিক বার নিষ্পত্তি হয় গেছে। আর কি নিষ্পত্তি হবে? আর যা হতে পারে তা হল বিষয়টি পুনর্বিবেচনার পর বাতিল করা বা বহাল রাখা। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন "হেস্তনেস্ত" কথাটি এখানে মোটেই খাটে না। তবও খাটান হল কারণ, লেখার ধাঁচে সমতা রাখায় অবহেলা।

একই খবরে কিছু পরে লেখা হয়েছে, দলের নেতৃত্ব "দিল্লির বিরুদ্ধে খুব চড়া সুরে জেহাদের রাস্তা এদিয়ে

এড়িয়ে গিয়েছেন"। "জেহাদ" বা "জিহাদ" কথার মানে "বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ"। এখানে জেহাদ না লিখে "সমালোচনা" বা "নিন্দা" লিখতে খবরের এতটুকু অঙ্গহানি হত না। লেখার ধাঁচে সমতা রাখার দিকে সতর্ক নজর থাকলে এ ক্ষেত্রে "জেহাদ" না লিখে "সমালোচনা" বা "নিন্দা" লেখা হত।

দৃষ্টান্ত বাড়ালে বাড়তেই থাকবে। তাই এই প্রসঙ্গে আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। ৯ আগস্ট ২০০২ তারিখে 'ক' কাগজে একটি খবরের শিরোনাম, "রাঢ়বঙ্গে বেস তৈরির ছক কষছে জনযুদ্ধ— মাওবাদীরা"।

ভেবে দেখুন তো, "বেস" লেখার বদলে "ঘাঁটি" লিখলে কাজ চলত কিনা। শিরোনামটি যে ভাবে লেখা হয়েছে তার বদলে "রাঢ় বঙ্গে মাওবাদী জঙ্গিদের ঘাঁটি তৈরির ছক" লিখলে বিষয়টি বুঝতে কারো কোন অসুবিধা হত না, বরং সুবিধাই হত।

এই সব দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে বলা হচ্ছে, লিখনপদ্ধতির সমতারক্ষার চেষ্টা না থাকলে কাগজে এই ধরনের শব্দ বিভ্রাট ঘটতে থাকবে। তাতে খবর বোঝায় অসুবিধা হবে। খবর স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ করার জন্যই লেখার ধাঁচে সমতারক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। তার অন্যথা হলে একই কাগজে একই দিনে জর্জ বুশকে কেউ "মার্কিন প্রেসিডেন্ট", কেউ "আমেরিকার রাষ্ট্রপতি" লিখে ফেলবেন; একই খবরে এক জায়গায় "মউ" আর এক জায়গায় "সমঝোতাপত্র" ছাপা হয়ে যাবে। এইরকম উল্টোপাল্টা ব্যাপার কোন সুসম্পাদিত কাগজের পক্ষে গৌরবের নয়।

খবর লিখনপদ্ধতির ও সম্পাদনার ধাঁচে সমতারক্ষার একটি সাধারণ নিয়মও খেয়াল রাখা দরকার। সেটি হল বাক্যের আকার কেমন হবে, অনুচ্ছেদের আকার কেমন হবে, ভাষা কেমন হবে, বক্তব্য নেতিবাচক হবে, না ইতিবাচক হবে। এই ব্যাপারে কালের কষ্টিপাথরে যাচাই করা নির্দেশিকা হল, ছোট ছোট বাক্য, ছোট ছোট অনুচ্ছেদ, মসৃণ ভাষা, নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক ভঙ্গি।

যে কাগজ তার রিপোর্টার, সাব-এডিটর ও অন্যান্য বিষয়ে লেখকদের ওই নির্দেশিকা মান্য করতে পারবে তা সলের প্রশংসা অর্জন করবে। পঞ্চাশ বা ষাট শব্দে গঠিত বাক্য পাঠক যতটা স্বচ্ছন্দে পড়তে পারবেন পাঁচ ছ'টি শব্দের বাক্য তার থেকে অনেক সহজে পড়া যাবে। পাঠক কষ্ট করে পড়বেন কেন? তাঁকে সহজে পড়াবার সুযোগ করে দিতে হবে।

৫.২.১৫ সংবাদ প্রদর্শনকলা

খবরের কাগজ আবির্ভাবের পর থেকে তাতে প্রদর্শনকলার (Display) জন্য বিশেষ কোন জায়গা ছিল না। পঞ্চাশের দশক থেকে কাগজগুলির সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রদর্শনকলার দিকে নজর দিতে শুরু করেন। তারও পরে খবরের কাগজ তৈরিতে হাই-টেক পদ্ধতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনকলা প্রয়োগের সুযোগ হঠাৎ খুবই বেড়ে যায়। সব কাগজই বুঝতে পারে পাঠক ও গ্রাহক টানতে হলে প্রদর্শনকলার দিকটি আর অবহেলা করা চলবে না। বরং তার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করতে হবে।

এই চেতনার বিকাশ হওয়ার পর থেকে প্রদর্শনকলার বিকাশও হয়েছে দ্রুত গতিতে। প্রদর্শনকলার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হল অঙ্গসজ্জা ও অঙ্গশোভার জন্য পরিকল্পনামাফিক নকশা প্রস্তুত করা। এ কাজ যাঁরা করবেন তাঁদের হরফ, ছবি ও গ্রাফিক্স সম্পর্কে প্রতিভা ও দক্ষতা থাকা দরকার। দরকার শিল্পীর মত চোখ ও মাত্রাজ্ঞান।

হরফ, ছবি, গ্রাফিক্সের সুসম ব্যবহার করার ক্রমতাই উন্নত মানের প্রদর্শনকলা। প্রয়োগের ক্ষেত্রে শেষ কথা। আর দরকার প্রদর্শনকলার রকমফের ঘটিয়ে তাতে বৈচিত্র্য আনা।

১১-৯-২০০২ তারিখে বিহারের রফিগঞ্জ ও দেওরোড স্টেশনের মধ্যে লাইনচ্যুত রাজধানী এক্সপ্রেসের ছবি আট কলম জুড়ে ছাপলে তা মোটেই বেমানান হবে না। একই ঘটনার ছবি দুই বা তিন কলম মাপের মধ্যে ছেপে দিলে ছবিটি যথাযথ গুরুত্ব পাবে না। প্রদর্শন-কুশলী সাংবাদিকের এই প্রাথমিক জ্ঞান না থাকলে কাগজ মার খেতে বেশি দেরি হবে না। কাগজের প্রতি গ্রাহকদের আকর্ষণ বাড়াবার একটি বিশেষ উপায় হিসাবে এখানেই প্রদর্শনকলার গুরুত্ব।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার। মনে করুন নানা রকম সুখাদ্য রান্না হল। আমন্ত্রিত অতিথিরাও এসে গেলেন। কিন্তু সে সব সুখাদ্য যেমন তেমন করে অতিথিদের সামনে ধরে দিলেন নিমন্ত্রণকর্তা। তাতে কোন আন্তরিকতার স্পর্শ নেই। নানা রকম খাদ্য পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। শালপাতার ওপর যেমন তেমন করে ঢেলে দেওয়া কতগুলি খাবার গড়াগড়ি যাচ্ছে। রান্না যতই সুন্দর হোক পরিবেশনে অবহেলার কারণে তার অনেকটা স্বাদই নষ্ট হয়ে যাবে না কি? কিন্তু তার বদলে সোনা বা রুপোর থালায় না হোক পরিষ্কার পাত্রে সেই সব খাদ্যগুলি সুচারুভাবে পরিবেশন করলে অতিথি তা সন্তোষের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। তৃপ্ত হতেন। নিমন্ত্রণকর্তার প্রশংসা করতে করতে বিদায় নিতেন।

খবরের কাগজে সুচারু প্রদর্শনকলার প্রয়োজন অনেকটা এই রকমই।

৫.৩ সারাংশ

প্রত্যেক খবরের কাগজের সম্পাদকীয় ও বার্তা বিভাগে নানা রকম কাজ থাকে। সেই সব কাজ করার জন্য নানা শ্রেণির ও নানা পদমর্যাদার সাংবাদিকের দরকার হয়। তাঁদের সকলের ওপরে থাকেন সম্পাদক। সব সাংবাদিকের সব কাজে জন্য আইনের চোখে সম্পাদক দায়ী থাকেন।

কিন্তু একটি পুরো কাগজের সবকিছু সম্পাদক এক হাতে লিখতে ও কোন ভুল থাকলে তা সংশোধন করতে পারেন না। সেই জন্য তিনি সাংবাদিকদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন।

সম্পাদকীয় বিভাগে সহকারী সম্পাদকরা কাগজের সম্পাদকের সাহায্যকারী। বার্তা বিভাগে সম্পাদককে সাহায্য করেন বার্তা সম্পাদক।

বার্তা সম্পাদকের একটি হাত চিফ সাব, আর একটি হাত চিফ রিপোর্টার। খবরের কাগজে পালাক্রমে কাজ চলে। প্রত্যেক পালা পরিচালনা করেন এক একজন চিফ সাব। কয়েকজন করে সব এডিটরের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিয়ে তাঁদের সাহায্যে নিউজ ডেস্কের কাজ চালান চিফ সাব। বাংলা কাগজের ডেস্কে সংবাদদাতা, রিপোর্টার এবং সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবরগুলি ছাপার জন্য তৈরি করা হয়।

রিপোর্টারদের সাহায্যে প্রকাশনা কেন্দ্রের অধীন শহরের যাবতীয় খবর যোগাড়ের ব্যবস্থা করেন চিফ রিপোর্টার। রিপোর্টারদের লেখা খবরগুলি প্রথমে তিনিই পরীক্ষা করে দেখেন। পরীক্ষার পর কপিগুলি ডেস্কে পাঠিয়ে দেন তিনি।

বিশেষ সংবাদদাতারা বিশেষ বিশেষ খবর লেখেন, খবর বিশ্লেষণ করেন, বিশেষ খবরের বিশেষ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন, পটভূমি বর্ণনা করেন।

স্তম্ভকার নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর বিশ্লেষণ করেন। সেই বিশ্লেষণ তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

এসব ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয় সম্পাদকের দফতরে। তার মধ্যে রয়েছে কাগজে ছাপার জন্য কপি নির্বাচন করা। প্রতিদিন কাগজে যত কপি ছাপা হয় তার সব কিছু একদিনের কাগজে ধরাবার জায়গা থাকে না। তাই কোন কোন কপি ছাপা হবে, আর কোনগুলি বাদ যাবে তা বাছাই করতে হয়। সে কাজ হয় ডেস্কে।

খবর ছোট বা বড় করা, দরকারে নতুন করে লেখা, উপযুক্ত শিরোনাম দেওয়া এসব কাজও সাব-এডিটররা করে থাকেন।

খবর সংস্কারের সময় কাগজের নীতি অনুযায়ী লিখনপদ্ধতির সমতাবিধান করা হয়েছে কিনা স দিকেও সাব-এডিটররা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

এই সব কাজ শেষ হলে আরম্ভ হয় বিশেষ করে প্রথম পাতাটি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রদর্শনকলা প্রয়োগ করা।

এই সব পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন সংবাদপত্র তৈরি হয়।

৫.৪ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। ভারতের সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।
২। সম্পাদককে কী কী চাপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তিনি কী ভাবে সেই সব চাপের মোকাবিলা করেন?
৩। খবরের কাগজের মূল উপাদান।
৪। ডেডলাইন (Deadline)।
৫। সমর সংবাদদাতাদের কাজ বিপজ্জনক— ব্যাখ্যা করুন।
৬। উত্তম রিপোর্টার।
৭। জিমির জগৎ (Jimmy's World)।
৮। সাব-এডিটরদের কাজ।
৯। স্তম্ভকারের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী।
১০। ওয়াল্টার লিপম্যান।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। সাংবাদিক কারা?
২। সব সাংবাদিককে কি একই ধরনের কাজ করতে হয়?

৩। সাংবাদিকদের শ্রেণিবিভাগ এবং পদবিন্যাস সম্পর্কে সর্বশেষ সরকারি চিঠি কোথায় পঞ্জিভুক্ত আছে?
৪। প্রত্যেক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রত্যেক পদের সাংবাদিক নিয়োগ করা কি বাধ্যতামূলক?
৫। বিধিতে বর্ণিত বিভিন্ন পদের সাংবাদিকের কাজের সংজ্ঞা কোথায় আছে?
৬। বিধিতে সাংবাদিকদের মোট কতগুলি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে?
৭। আইন অনুযায়ী সংবাদপত্র কাকে বলে?
৮। আইনের চোখে সম্পাদক।
৯। ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে সম্পাদক।
১০। আইন অনুযায়ী খবরের কাগজে প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পাদকের দায়িত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
১১। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে সংবিধানে কি ব্যবস্থা আছে?
১২। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কিভাবে পাওয়া গেল?
১৩। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অবাধ অথবা সীমাবদ্ধ—সংক্ষেপে উত্তর দিন।
১৪। ভারতের সংবিধানের ১৯(২) ধারার বিষয়বস্তু বর্ণনা করুন।
১৫। সফল সম্পাদক কে?
১৬। খবরের কাগজের শক্তির উৎস কারা?
১৭। খবরের কাগজের ব্যর্থতার দায় কার?
১৮। অ্যাডলফ এস ওখস সাংবাদিক নিয়োগে কি মাপকাঠি ব্যবহার করতেন?
১৯। সব রকম খবর কি ছাপার যোগ্য—এই ব্যাপারে অ্যাডলফ ওখসের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল?
২০। এ ব্যাপারে অ্যাডলফ ওখসের নীতি কি এখনও বহাল আছে?
২১। সত্যেন্দ্রনাথ মুজমদার কোন কাগজে সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন?
২২। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার পরবর্তী জীবনে কোন কোন কাগজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন?
২৩। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কলমের জোর কেমন ছিল?
২৪। সত্যেন্দ্রনাথর মজুমদার কোন সম্পেলনে খবরের কাজ ও তার সম্পাদক সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন?
২৫। খবরের কাগজকে সত্যেন্দ্রনাথ কী চোখে দেখতেন?
২৬। খবরের কাগজের সম্পাদককে সত্যেন্দ্রনাথ কিভাবে বর্ণনা করেছেন?
২৭। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন?
২৮। অমৃতবাজার পত্রিকা কোন ভাষায় প্রকাশিত হত?
২৯। অমৃতবাজার পত্রিকার নীতি কি ছিল?
৩০। অমৃতবাজার পত্রিকাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তার সম্পাদক?
৩১। অমৃতবাজার পত্রিকাকে কোন রাজপুরুষ কিভাবে বশ করার চেষ্টা করেছিলেন? তাঁর চেষ্টা কি সফল হয়েছিল?
৩২। অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা কাগজ যুগান্তর-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন?
৩৩। তাঁর সাংবাদিক জীবন কোন কাগজে আরম্ভ হয়েছিল?
৩৪। তাঁর কোন সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি প্রকাশের জন্য সরকার কাগজের জামানত বাজেয়াপ্ত করেছিল?

৩৫। যুগান্তরে প্রকাশিত তাঁর কোন সম্পাদকীয় নিবন্ধটির জন্য সরকার ব্যবস্থা নিয়েছিল? এই বিষয়ে যা জানেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

৩৬। সম্পাদক ও সম্পাদকীয় সম্পর্কে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের শেষ জীবনে কি ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল?

৩৭। সম্পাদক ও সম্পাদকীয়ের অবমূল্যায়ন হয়েছে এই মতের পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার মন্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

৩৮। নির্বাহী সম্পাদকের কাজ সম্পর্কে যা জানেন তা লিখুন।

৩৯। বেন ব্রাডলি কোন কাগজের নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে তাঁর সহকর্মীরা কি বলত? তাঁর পুরো নাম কি?

৩৯। নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে বেন কি লক্ষ্য স্থির করেছিলেন?

৪০। বেন ব্রাডলির দৈনন্দিন কাজের রুটিন কি ছিল?

৪১। এ এস রোসেনথাল কোন কাগজের নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন? তাঁর পুরো নাম কি?

৪২। তিনি প্রথম জীবনে নিউইয়র্ক টাইমসে কি পদে কাজ করতেন?

৪৩। বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসাবে তিনি কোন দেশে কাজ করেছেন?

৪৪। তিনি নিউইয়র্ক টাইমসের ম্যানেজিং এডিটর থাকাকালে ওই কাগজে সবচেয়ে বড় কি খবর ফাঁস হয়েছিল এবং তার বিষয়বস্তু কি ছিল?

৪৫। সহকারী সম্পাদকের কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

৪৬। সহকারী সম্পাদকদের ওপর কি কি কাজের ভার দেন সম্পাদক?

৪৭। সম্পাদকীয় পাতার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যই সহকারী সম্পাদকদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়— ব্যাখ্যা করুন।

৪৮। সহকারী সম্পাদকরা কি পদ্ধতিতে লেখার বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন?

৪৯। খবরের কাগজে বার্তা সম্পাদক কি কাজ করেন?

৫০। খবরের কাগজের মূল উপাদান সম্পর্কে কী জানেন?

৫১। স্থানীয় সংবাদ কী?

৫২। রাজ্যস্তরের সংবাদ কী?

৫৩। জাতীয় স্তরের সংবাদ কী?

৫৪। আন্তর্জাতিক সংবাদ কী?

৫৫। 'সার্ভেন্ট' পত্রিকা কোন রাজনীতির সমর্থক ছিল? তার বিরোধী মতের সমর্থক ছিল কোন পত্রিকা।

৫৬। সার্ভেন্টের সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদক কারা ছিলেন?

৫৭। একজন বার্তা সম্পাদকের কাজের রুটিন কেমন হওয়া উচিত?

৫৮। বার্তা সম্পাদক কাজের মাধ্যমে বার্তা বিভাগের কাজের সমন্বয় করেন কিভাবে?

৫৯। একজন সফল বার্তা সম্পাদকের কি কি গুণ থাকা দরকার?

৬০। বার্তা সম্পাদকের গুরুত্ব কমাতে বেন কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

৬১। নিউজ ডেস্ক নির্দিষ্ট পালার পরিচালক কে?

৬২। নিউজ ডেস্কের পরিচালককে কি কি কাজ করতে হয়— সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৬৩। সকালের খবরের কাগজে সাধারণত কতগুলি শিফটে কাজ হয়?
৬৪। কোন পালায় খবরের চাপ সবথেকে বেশি বেড়ে যায়?
৬৫। রাতের পালায় কোন কাজের চাপ আসে?
৬৬। সাব-এডিটরদের কোন কোন কাজের ভার দেন চিফ সাব?
৬৭। চিফ সাব বার্তা সম্পাদকের চোখ ও ডান হাত— ব্যাখ্যা করুন।
৬৮। মাঝের পালার চিফ সাব কি ভাবে কাজ করেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৬৯। প্রথম পাতা সাজাবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি ভাবে নেওয়া হয়?
৭০। কাগজ ছাপার আদেশ কে দেন?
৭১। কাগজ ছাপার আদেশ দেবার আগে তা নির্ভুল করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়?
৭২। ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে চিফ রিপোর্টারকে কি ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
৭৩। রিপোর্টারদের সর্বেসর্বা তাঁদের চিফ রিপোর্টার— ব্যাখ্যা করুন।
৭৪। রিপোর্টারদের মধ্যে কারা চিফ রিপোর্টারের অধীন এবং কারা নয় তা বর্ণনা করুন।
৭৫। চিফ রিপোর্টারের পরের দিনের কাজ শুরু হয় আগের দিন রাতে— ব্যাখ্যা করুন।
৭৬। বার্তা বিভাগের কাজে সমন্বয় সাধনের জন্য চিফ রিপোর্টারকে কি করতে হয় তা বর্ণনা করুন।
৭৭। রিপোর্টারদের কপি কে কি ভাবে প্রাথমিক পরীক্ষা করেন?
৭৮। চিফ রিপোর্টারের ওপরওলা কে?
৭৯। কোন রিপোর্ট হাতছাড়া হলে তার জন্য কে কার কাছে কৈফিয়ৎ দেন?
৮০। বিশেষ সংবাদদাতার কাজকর্ম সম্পর্কে যা জানের তা বর্ণনা করুন।
৮১। বিশেষ সংবাদদাতা শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য সংবাদদাতাদের পদগুলি উল্লেখ করুন।
৮২। নির্বাচনে কোন ক্ষমতাসীন দল তুলনামূলকভাবে খুব কম গরিষ্ঠতা পেয়ে জয়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবার দেবার দায়িত্ব রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের ওপর পড়ে?
৮৩। ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী একজন সাব-এডিটরকে কি কি কাজ করতে হয়?
৮৪। ছাপার ব্যাপারে খবরেরঅগ্রাধিকার কি বাবে নির্ধারিত হয়?
৮৫। রিপোর্টারের কপিতে কোন কোন গলদ থাকলে দক্ষ সাব-এডিটর তা ছাঁটাই করেন?
৮৬। কোন অভিযোগে আদালত কাউকে সাজা দিয়েছে কপিতে এমন কথা লেখা হলে সাব-এডিটর কি করবেন?
৮৭। ভারত সরকারের সংজ্ঞায় রিপোর্টার কাকে বলে?
৮৮। রিপোর্টারকে কি কি কাজ করতে হয়?
৮৯। খবর বলতে আপনি কি বোঝেন?
৮৯। বাস্তবে যা ঘটে বা যা বলা হয় তার মধ্যে খবর বলে কোন বিষয়গুলি বিবেচিত হয়?
৯০। খবর চেনার জ্ঞান কাকে বলে?
৯১। খবরের রকমফের আছে— ব্যাখ্যা করুন।
৯২। প্রত্যাশিত খবর সম্পর্কে যা জানেন তা লিখুন।
৯৩। অপ্রত্যাশিত খবর বলতে কি বোঝেন?

৯৪। প্রত্যাশিত খবরের কি অপ্রত্যাশিত পরিণতির দু'একটি উদাহরণ দিন।

৯৫। "চন্দ্রকোণায় প্রায় চার একর জমি আত্মসাতের অভিযোগ" শিরোনামে প্রকাশিত খবরটি ঠিক করে সংক্ষিপ্তভাবে লিখুন।

৯৬। প্রেস কার্ড সম্পর্কে যা জানলেন তা লিখুন।

৯৭। পুরো সত্য লেখা রিপোর্টারের কাজ নয়, তার পক্ষে তা সম্ভবও নয়— ব্যাখ্যা করুন।

৯৮। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল কেন?

৯৯। স্তম্ভকারের কাজ কারা করেন?

১০০। স্তম্ভলেখক জে এন সাহানি এবং এস নিহাল সিং সম্পর্কে কী জানেন?

১০১। ওয়াল্টার লিপম্যানের লেখা কয়েকটি স্তম্ভের শিরোনাম লিখুন।

১০২। খবরের কাগজের বিষয়বস্তু নির্বাচনের পদ্ধতি ও গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

১০৩। খবর নির্বাচনে বারবার ভুল হতে থাকলে তার পরিণাম কি হয়?

১০৪। সাধুভাষায় লেখা উপরের খবরটি চলিতভাষায় লিখুন।

১০৫। বাংলা খবরের কাগজে চলিতভাষা চালু হওয়ার সময়ে কাদের কী অসুবিধা হত?

১০৬। লিখনপদ্ধতির রক্ষার ব্যবস্থা কেন দরকার তা দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

১০৭। লেখার ধাঁচে সমতারক্ষার সাধারণ নির্দেশিকা কি?

১০৮। পাঠকের পছন্দ ছোট ছোট বাক্য, না বড় বড় বাক্য— আপনি কি মনে করেন?

১০৯। সম্পাদকের কাজ ও দায়িত্ব।

১১০। সহকারী সম্পাদকদের কাজ।

১১১। চিফ সাব এডিটরের কাজ।

১১২। চিফ রিপোর্টারের কাজ।

১১৩। সাব এডিটরদের কাজ।

১১৪। রিপোর্টারদের কাজ।

১১৫। বিশেষ সংবাদদাতাদের কাজ।

১১৬। লিখনপদ্ধতির সমতাবিধানের প্রয়োজন।

১১৭। প্রদর্শনকলার গুরুত্ব।

১১৮। বিষয়বস্তু নির্বাচনের পদ্ধতি ও গুরুত্ব।

টীকা লিখুন :

১। অ্যাডলফ এস ওখস।

২। The Vernacular Press Act.

৩। ওই আইনকে এড়াবার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকার ব্যবস্থা।

৪। বেন ব্রাডলি।

৫। ডেস্ক

৬। বাসি, খবর, এঁটো খবর।

শূন্যস্থান পূরণ করুন :

১। খবরের কাগজের প্রতিটি মুদ্রিত সংখ্যায় তার _____ নাম ছাপা বাধ্যতামূলক।

২। _____ খবরের কাগজের শক্তির একমাত্র উৎস।

৩। শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর কাগজকে _____ সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

৪। _____ কাজে সহকারী সম্পাদক নিয়মিতভাবে সাহায্য করেন।

৫। বার্তা বিভাগের যাবতীয় কাজের সমন্বয় করেন _____ _____।

৬। খবরের কাগজের প্রধান উপাদন _____।

৫.৫ উত্তর-সংকেত

প্রশ্ন ৫.১ (ক) ১.১ অনুচ্ছেদ থেকে নিজে উত্তর করুন।

প্রশ্ন ৫.২ (ক) ১.২ অনুচ্ছেদ থেকে নিজে উত্তর করুন।

প্রশ্ন ৫.২.১ (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ) : অনুচ্ছেদটি থেকে উত্তর খুঁজে নেওয়া খুব সহজ কাজ।

প্রশ্ন ৫.২.১ (i) (ক) অনুচ্ছেদটি থেকে উত্তর তৈরি করুন।

প্রশ্ন ৫.২.২ (ii) (ক), (খ), (গ) অনুচ্ছেদের মধ্যেই উত্তর আছে।

প্রশ্ন ৫.২.২ (iii) (ক) ভারতের সংবিধানের ১৯(১) (ক) ধারায় নাগরিকদের বক্তব্য ও মনোভাব প্রচার করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই অধিকার ভারতের প্রতিটি নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। এই ধারার ব্যাখ্যা করে আদালত বলে দিয়েছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ওই ধারার অন্তর্গত একটি বিষয়।

(খ) ভারতের সংবিধানের ১৯(১) (ক) ধারার ব্যাখ্যা করে আদালত বলে দিয়েছে, সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা ওই ধারার অন্তর্গত একটি বিষয়। আদালতের এই ব্যাখ্যাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হয়ে আছে।

(গ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একদিকে অবাধ, অন্যদিকে সীমাবদ্ধ। সংবিধানসম্মতভাবে যে কোন বিষয়ে নিজস্ব চিন্তা, ভাবনা, সমর্থন, বিরোধিতা, প্রশংসা, সমালোচনা সবকিছুই বিনা বাধায় খবরের কাগজে লেখার স্বাধীনতা আছে।

অন্যদিকে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কুৎসা, অশ্লীলতা, হিংসায় প্ররোচনা, সাম্প্রদায়িকতা, দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বিষয় সংবাদপত্রে লেখা চলে না। তবুও তেমন কিছু লেখা হলে তা বেআইনি ও দণ্ডযোগ্য বলে গণ্য হবে। সেই হিসেবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইনের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ।

(ঘ) নিজে লেখার চেষ্টা করুন।

প্রশ্ন ৫.২.২ (iv) (ক) যে সম্পাদক তাঁর কাগজের দিকে পাঠকদের বেশি করে টানতে ও ধরে রাখতে পারেন তিনি একজন সফল সম্পাদক বলে স্বীকৃত হন।

(খ) পাঠকরাই খবরের কাগজের শক্তির একমাত্র উৎস।

(গ) পাঠকদের কাগজের দিকে টানতে ও ধরে রাখতে ব্যর্থতার দায় একমাত্র সম্পাদকের।

প্রশ্ন ৫.২.২ (v) (ক) ও (খ) অনুচ্ছেদের মধ্যে থেকে উত্তর বার করে লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.২ (vi) (ক) অ্যাডলফ এস ওখস মনে করতেন সমকামিতা, যৌনতা, দৈহিক ব্যাপার ছাড়া বাকি সব খবরই ছাপার যোগ্য।

(খ) খবরের যোগ্যতা নির্ধারণে ওখসের নীতি এখন আর বহাল নেই।

প্রশ্ন ৫.২.২ (vii) (ক) আনন্দবাজার পত্রিকা।

(খ) যুগান্তর, অরণি, স্বরাজ, সত্যযুগ।

(গ) সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মৃত্যুর পর আনন্দবাজার পত্রিকায় এই বিষয়ে বলা হয়েছিল, তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ, তীক্ষ্ণধী, শক্তিমান লেখক। সম্পাদকরূপে তিনি ছিলেন সব্যসাচী।

(ঘ) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ৩৮তম অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ খবরের কাগজ ও সম্পাদকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরে ওই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(ঙ) অনুচ্ছেদটি পড়ে নিজে উত্তর লিখুন।

(চ) অনুচ্ছেদটির প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করে নিজের ভাষায় উত্তর লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.২ (viii) (ক) শিশিরকুমার ঘোষ।

(খ) সূচনায় ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হত। পরে তা সম্পূর্ণ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হত।

(গ) অনুচ্ছেদটি পড়ে নিজের ভাষায় উত্তর লিখুন।

(ঘ) অমৃতবাজার পত্রিকাকে ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ।

(ঙ) বাংলার লাটসাহেব স্যার অ্যাশলি ইডেন অমৃতবাজার পত্রিকাকে বশ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লাটসাহেবের দেওয়া ক্ষমতার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ।

(চ) অনুচ্ছেদটি পড়ে নিজের ভাষায় লিখুন।

(ছ) আইন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক কাগজটিকে পুরোপুরি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রশ্ন ৫.২.২ (ix) (ক) বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

(খ) আনন্দবাজার পত্রিকা।

(গ) সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল, "সাহিত্যে সরকারি দৌরাত্ম্য"।

(ঘ) প্রশ্নের উত্তরটি নিজে লিখুন।

(ঙ) শেষ জীবনে বিবেকানন্দের মনে হয়েছিল সম্পাদকের বা সম্পাদকীয়ের অবমূল্যায়ন ঘটেছে।

(চ) প্রশ্নের উত্তর নিজে লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.৩ : নির্বাহী সম্পাদক সম্পাদকের বকলমে সম্পাদকীয় দপ্তর পরিচালনা করেন। তার পদাধিকার সম্পাদকের সমতুল্য হলেও তাঁর ক্ষমতা সম্পাদকের সমান নয়। তাঁকে নিয়ন্ত্রণের রাশ থাকে সম্পাদকের হাতে।

প্রশ্ন ৫.২.৩ (i) (ক) বেন ব্রাডলি দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজের নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সহকর্মীরা বলতেন ধূর্ত চটপটে শেয়াল। তাঁর পুরো নাম ছিল, বেঞ্জামিন ক্রাউনিনশিল্ড ব্রাডলি।

(খ) নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে বেন ব্রাডলির লক্ষ্য ছিল ওয়াশিংটন শহরে পোস্টকে সর্বাধিক পঠিত খবরের কাগজে পরিণত করা।

(গ) বেন ব্রাডলি প্রতিদিন সকাল সকাল দফতরে আসতেন। নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে রিপোর্টার এবং সাব-এডিটরদের মহলে টহল দিতেন।

প্রশ্ন ৫.২.৩ (ii) (ক) নিউইয়র্ক টাইমস। আব্রাহাম মাইকেল রোসেনথাল।

(খ) আংশিক সময়ের সংবাদদাতা।

(গ) ভারত, পোল্যান্ড এবং জাপান।

(ঘ) অনুচ্ছেদটি পড়ে নিজে উত্তর লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.৪ (ক) সম্পাদকের কাজে সহকারী সম্পাদক নিয়মিতভাবে সাহায্য করেন। সম্পাদকীয় নিবন্ধসহ মন্তব্য ও মতামতধর্মী বিভিন্ন বিষয়ে লেখাও তাঁর কাজ।

প্রশ্ন ৫.২.৪ (i) (ক) ও (খ) নিজে উত্তর তৈরি করুন।

প্রশ্ন ৫.২.৪ (ii) (ক) সহকারী সম্পাদকরা রোজ দুপুরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময় করে সম্পাদকের অনুমোদন ক্রমে লেখার বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিকোণ স্থির করেন।

প্রশ্ন ৫.২.৫ (ক) বার্তা সম্পাদক খবরের কাগজের বার্তাবিভাগের যাবতীয় কাজে সমন্বয় ও তদারক করেন।

প্রশ্ন ৫.২.৫ (i) (ক) স্থানীয়, রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন খবরকে খবরের কাগজের মূল উপাদন বলা হয়।

(খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) : নিজে ভাবনা চিন্তা করে বিস্তারিত উত্তর লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.৫ (ii) (ক) "সার্ভেন্ট" পত্রিকা গান্ধীজি ও কংগ্রেসের রাজনীতি সমর্থন করত। তার বিপরীত রাজনীতি সমর্থন করত "ফরোয়ার্ড"।

(খ) "সার্ভেন্ট"-এর সম্পাদক ছিলেন পন্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং বার্তাসম্পাদক ছিলেন বিধুভূষণ সেনগুপ্ত।

(গ) অনুচ্ছেদে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিজের উত্তর রচনা করুন।

(ঘ) চিফ সাব-এডিটর এবং চিফ রিপোর্টারের মাধ্যমে বার্তা সম্পাদক বিভাগীয় কাজকর্ম সমন্বয় ও তদারক করেন।

প্রশ্ন ৫.২.৫ (iii) (ক) একজন সফল বার্তা সম্পাদকের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা দরকার—

আপৎকালে বিভিন্ন বিষয়ে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জ্ঞান।

প্রাসঙ্গিক খবরকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য কী কী উপাদন দরকার সেই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা।

সেই সব উপাদান যোগাড়ের সূত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা।

খবরের গুরুত্ব এক লহমায় বুঝে নেবার মত ঘ্রাণশক্তি ও পাঠকদের নাড়ীজ্ঞান।

একটানা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার মত মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা।

প্রশ্ন ৫.২.৫ (iv) (ক) দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক। পুরো নাম বেঞ্জামিন ক্রাউনিনশিল্ড ব্রাউলি।

(খ) বার্তা সম্পাদকের গুরুত্ব কমাতে বেন ব্রাডলি বার্তাবিভাগকে তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করেন—বৈদেশিক, জাতীয় ও স্থানীয়। তিনজন ডেপুটি ম্যানেজিং এডিটরকে তিনি ওই তিনটি উপবিভাগ পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৫.২.৬ (ক) চিফ সাব-এডিটর, সংক্ষেপে চিফ সাব।

(খ) নিউজ ডেস্কের পচিচালক চিফ সাব তাঁর হাতের খবরগুলি সম্পাদনা করার জন্য সাব-এডিটরদের মধ্যে ভাগ করে দেন, তাঁদের কাছ থেকে কাজ বুঝে নেন, কোন খবর, কোন পাতার কোন জায়গায় কতটা স্থান জুড়ে ছাপা হবে তা ঠিক করেন।

প্রশ্ন ৫.২.৬ (i) (ক) তিনটি— দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত।

(খ) সন্ধ্যার পালায় খবরের চাপ সবচেয়ে বেশি থাকে।

(গ) রাতের পালায় কাগজের প্রথম পাতা সাজাবার চাপ সবথেকে বেশি থাকে।

প্রশ্ন ৫.২.৬ (ii) (ক) সাব-এডিটরদের রিপোর্টারদের কপি সম্পাদনার ভার দেন চিফ সাব। বাংলা কাগজে সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর তরজমা এবং সম্পাদনাও তাঁদের করতে দেওয়া হয়।

(খ) নির্দিষ্ট পালার মধ্যে ডেস্ক যে-সব খবরের বিলি বন্দোবস্ত করে তার ব্যবস্থাপনা করে থাকেন চিফ সাব। সেই জন্য তাঁকে বার্তা সম্পাদকের চোখ ও ডান হাত বলে বর্ণনা করা হয়।

প্রশ্ন ৫.২.৬ (iii) (ক) নিজে লেখার চেষ্টা করুন।

প্রশ্ন ৫.২.৬ (iv) (ক) বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে সন্ধ্যা ও রাতের পালার চিফ সাবদ্বয় বৈঠক করে প্রথম পাতা সাজাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

(খ) চিফ সাব কাগজ ছাপার আদেশ দেন।

(গ) পুরো প্রথম পাতার প্রুফটি তিনি আগাগোড়া সতর্কভাবে পরীক্ষা করার পর কাগজ ছাপার অনুমতি দেন।

প্রশ্ন ৫.২.৬ (v) (ক) চিফ সাব যে টেবিলে সাব-এডিটরদের নিয়ে যাবতীয় সংবাদ সম্পাদনা করেন তাকে নিউজ ডেস্ক সংক্ষেপে ডেস্ক বলা হয়।

প্রশ্ন ৫.২.৭ (ক) নিজে লিখুন।

(খ) খবরের কাগজের মূল কেন্দ্রে নিযুক্ত রিপোর্টাররা চিফ রিপোর্টারের দ্বারা পরিচালিত হন। এই জন্য চিফ রিপোর্টারকে রিপোর্টারদের সর্বেসর্বা বলা হয়।

প্রশ্ন ৫.২.৭ (i) (ক) খবরের কাগজের মূল কেন্দ্রে নিযুক্ত স্টাফ রিপোর্টাররা চিফ রিপোর্টারের অধীন। বিশেষ সংবাদদাতা, রাজনৈতিক সংবাদদাতা, সংসদীয় সংবাদদাতারাও রিপোর্টার কিন্তু তাঁরা কেউ চিফ রিপোর্টারের দ্বারা পরিচালিত হন না।

প্রশ্ন ৫.২.৭ (ii) (ক) সারা দিনের কাজ সুসম্পন্ন করে রাতে বাড়ি ফেরার আগে চিফ রিপোর্টার পরের দিনের প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত খবর সংগ্রহের জন্য রিপোর্টারদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দেন। এই জন্যেই বলা হয় চিফ রিপোর্টারের পরের দিনের কাজ আরম্ভ হয় আগের দিন রাতে।

প্রশ্ন ৫.২.৭ (iii) (ক) ঘটনাপ্রবাহের গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরের দিনের কাগজ প্রকাশের পরিকল্পনা করা এবং প্রয়োজনে তার রদবদলের ব্যাপারে ডেস্কের সঙ্গে রিপোর্টিং বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন করেন চিফ রিপোর্টার।

প্রশ্ন ৫.২.৭ (iv) (ক) রিপোর্টারদের কপি প্রথম পরীক্ষা করেন চিফ রিপোর্টার। সমস্ত তথ্য নির্ভুল কি না, মুখবন্ধ ঠিকভাবে লেখা হয়েছে কিনা এবং বাক্যগঠন ও শব্দপ্রয়োগ যথাযথ কি না ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখা চিফ রিপোর্টারের কাজ। কপিতে অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক এবং ব্যক্তিগত মন্তব্য থাকলে তা কড়া হাতে কলম চালিয়ে কেটে দেওয়াও তাঁর কাজ।

প্রশ্ন ৫.২.৭ (v) (ক) বার্তা সম্পাদক চিফ রিপোর্টারের ওপরওলা।

(খ) কোন বড় খবর হাতছাড়া হলে চিফ রিপোর্টারের কাছে তার কারণ জানতে চাইতে পারেন বার্তা সম্পাদক।

প্রশ্ন ৫.২.৮ (ক) বিশেষ সংবাদবাতা আইনসভা, সংসদ, রাজনৈতিক বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ খবর লেখেন এবং তা বিশ্লেষণ করেন। তিনি কাগজের মূল কেন্দ্র, এক বা একাধির রাজ্যের রাজধানী, দেশের রাজধানী বা বিদেশে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হতে পারেন বা বিশেষ কোন ঘটনার খবর সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হতে পারেন।

প্রশ্ন ৫.২.৮ (i) (ক) রাজনৈতিক সংবাদবাদাতা, বৈদেশিক সংবাদদাতা, সমর সংবাদদাতা, সংসদীয় সংবাদদাতা ও শ্রেণিগতভাবে বিশেষ সংবাদদাতার সমতুল্য।

প্রশ্ন ৫.২.৮ (ii) (ক) সেই প্রশ্নগুলি হল—

বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী কি ফের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন?

নতুন মন্ত্রিসভা কেমন হবে?

পুরান মন্ত্রীদের মধ্যে কারা বাদ যাবেন?

নতুন মন্ত্রী কারা হতে পারেন?

পুরান মন্ত্রীদের মধ্যে কাদের ক্ষমতা বাড়বে?

এত স্বল্পগরিষ্ঠতার সরকার কতদিন স্থায়ী হবে?

বিরোধী পক্ষ কি ভাবছেন?

প্রশ্ন ৫.২.৯ (ক) নিজে লিখুন।

(খ) খবরের গুরুত্ব, তা ঘটার সময় এবং খবরটি কখন ডেস্কে এল তা বিচার করে খবরের অগ্রাধিকার স্থির করা হয়।

(গ) দিনের খবর দিনের মধ্যে ডেস্কে না এলে তা বাসি খবর হয়ে যায়। অন্য কাগজে আগেই বেরিয়ে যাওয়া খবর এঁটো খবর বলে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন ৫.২.৯ (i) (ক) রিপোর্টারের কপিতে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি, নিজস্ব মন্তব্য, একপশে ও পক্ষপাতদুষ্ট বক্তব্য নজরে পড়লে তা বর্জন করা সাব-এডিটরের অন্যতম কাজ।

প্রশ্ন ৫.২.৯ (ii) (ক) সাব-এডিটর ভুল শব্দটি বাদ দিয়ে ঠিক শব্দটি লেখবার জন্য রিপোর্টারকে বলবেন। অথবা নিজেই ভুলটি ঠিক করে দেবেন। এক্ষেত্রে "অভিযোগ" সাজার কারণ বলে বর্ণনা করা ভুল। সাজার কারণ "অপরাধ" লেখা ঠিক।

প্রশ্ন ৫.২.১০ (ক) নিজে লিখুন।

(খ) রিপোর্টার খবর যোগাড় করেন, লেখেন এবং ছাপার জন্য চিফ রিপোর্টারকে দেন।

(গ) যে ঘটনা নতুন ঘটল তা যখন সাধারণ মানুষ জানতে চায় তখন তা খবরে পরিণত হয়।

(ঘ) বাস্তবে যত ঘটনা ঘটে তার মধ্যে যেগুলির বিবরণ জানতে অনেক মানুষের আগ্রহ থাকে সেগুলি খবর বলে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন ৫.২.১০ (i) (ক) খবর প্রধানত দু'রকম—প্রত্যাশিত খবর এবং অপ্রত্যাশিত খবর।

(খ) যে-সব ঘটনা আগে থেকে নির্ধারিত থাকে এবং যে-সব সূত্র থেকে খবর পাবার সম্ভাবনা থাকায় রিপোর্টার সময়মত হাজির সেগুলি প্রত্যাশিত খবর।

(গ) যে-সব ঘটনা আগাম জানান না দিয়ে হঠাৎ বা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ঘটে যায় সেগুলি অপ্রত্যাশিত খবর।

(ঘ) নিজে লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.১০ (ii) (ক) নিজে লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.১০ (iii) (ক) প্রেস কার্ড রিপোর্টারদের দেওয়া সরকারি পরিচয়পত্র। নিরাপত্তার কারণে সংরক্ষিত এলাকায় প্রেস কার্ড থাকলে ঢোকা যায়। বিপজ্জনক এলাকায় খবর যোগাড়ের জন্য যেতে হলে সঙ্গে প্রেস কার্ড থাকা দরকার।

প্রশ্ন ৫.২.১০ (iv) (ক) রিপোর্টার কখনও কোন কারণে মিথ্যা খবর লিখবেন না। তবে পুরো সত্য লেখা তাঁর কাজ নয়, তার পক্ষে ত সম্ভবও নয়। তার অনেক কারণ। ধরুন, একজন জননেতা টানা এক ঘণ্টা ধরে ভাষণ দিলেন। পুরো সত্য লিখতে গেলে পুরো ভাষণটাই লিখতে হয়। কিন্তু কাগজে তা ছাপার জায়গা হবে না। জায়গা হলেও পাঠকরা তা পড়বেন না। সুতরাং ভাষণের যেটুকু অংশ জনসাধারণের জানা দরকার বলে রিপোর্টার মনে করবেন তিনি সততার সঙ্গে, অবিকৃতভাবে এবং প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন না করে সেই অংশটুকু খবরে ব্যবহার করবেন।

প্রশ্ন ৫.২.১০ (v) (ক) ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি নিউইয়র্ক টাইমসে ফাঁস হয়েছিল। তার জেরে রিচার্ড নিক্সন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ওয়াটারগেট ওয়াশিংটনের একটি বিশাল আবাসন। এর একটি ফ্ল্যাটে নিক্সনের প্রতিপক্ষ ডেমোক্রাটিক পার্টির একটি অফিস ছিল। সেই অফিসে ডেমোক্রাটিক পার্টির বড় বড় নেতারা নির্বাচনের কৌশল আলোচনা করতেন। অফিসটিতে সিঁধ কেটে চুরি করতে গিয়ে পাঁচজন লোক ধরা পড়ে। বব উডওয়ার্ড এবং কার্ল বার্নস্টাইনসহ নিউইয়র্ক টাইমসের কয়েকজন রিপোর্টার অনুসন্ধান করে লিখতে থাকেন, ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতাদের গোপন কথাবার্তা শোনার জন্য আড়ি পাতার যন্ত্র বসাবার চেষ্টা হয়েছিল। এই কাজে হোয়াইট হাউসের মদত ছিল। সব ব্যাপারটা রাষ্ট্রপতি নিক্সনের জ্ঞাতসারে ঘটেছিল।

প্রশ্ন ৫.২.১১ (i) (ক) সম্পাদক তাঁর কাগজের কোন স্থায়ী সাংবাদিককে স্তম্ভকারের দায়িত্ব দিতে পারেন। কাগজের বাইরের কোন সাংবাদিক বা বুদ্ধিজীবীকে দিয়েও সে কাজ করাতে পারেন। খবরের কাগজে দু'রকম পদ্ধতিই চালু আছে।

প্রশ্ন ৫.২.১১ (ii) (ক) জে এন সাহানি ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত হিন্দুস্তান টাইমস-এর সম্পাদক ছিলেন। পরে তিনি বিভিন্ন কাগজে স্তম্ভ নিবন্ধ লিখতেন।

এস নিহাল সিং দীর্ঘকাল দি স্টেটসম্যান-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি ওই কাগজে সাপ্তাহিক স্তম্ভ নিবন্ধ লিখতেন। তাঁর সেই স্তম্ভের নাম ছিল 'A Political Notebook'.

প্রশ্ন ৫.২.১১ (iii) (ক) নিজে লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.১২ (ক) খবর নির্বাচনের একমাত্র মাপকাঠি খবরের গুরুত্ব।

(খ) খবরের গুরুত্ব নির্ধারণে ভুল হতে থাকলে কাগজ ক্রমশ পাঠকদের মন থেকে দূরে সরে যায়। কাগজের বিক্রি পড়তে থাকে। বিজ্ঞাপনদাতারা সেই কাগজ সম্পর্কে আগ্রহ হারায়।

প্রশ্ন ৫.২.১৪ (i) (ক) নিজে লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.১৪ (ii) (ক) বাংলা খবরের কাগজে সাধুভাষা বর্জন করে চলিতভাষা চালু হবার সময় রিপোর্টার ও সাব-এডিটরদের সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহারে অসুবিধা হত। যেমন— এটা ওটা সেটা লিখতে তাঁদের কলম সরত না। সে সবের বদলে ইহা উহা তাহা লিখে ফেলতেন।

প্রশ্ন ৫.২.১৪ (iii) (ক) কাগজে শব্দ বিভ্রাট পরিহার করে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ করার জন্যই লিখনপদ্ধতির সমতারক্ষা করা দরকার। তা না হলে একই দিনে একই কাগজে একই খবরে এক জায়গায় মউ আর এক জায়গায় সমঝোতাপত্র ছাপা হয়ে যাবে। এরকম এলেমেলো ব্যাপার কোন সুসম্পাদিত কাগজের পক্ষে গৌরবজনক নয়।

প্রশ্ন ৫.২.১৪ (iv) (ক) লিখনপদ্ধতির সমতাবিধানের একটি সাধারণ নিয়ম হল— ছোট ছোট বাক্য, ছোট ছোট অনুচ্ছেদ, সরল ও মসৃণ ভাষা এবং ইতিবাচক ভঙ্গি অনুসরণ করা।

(খ) ছোট ছোট বাক্যে লেখা খবর নিবন্ধ ইত্যাদি পাঠকরা পছন্দ করেন। কারণ লম্বা লম্বা বাক্য ও বড় বড় অনুচ্ছেদের লেখা পড়তে পাঠকের অসুবিধা হয়। কিন্তু ছোট ছোট বাক্য ও ছোট ছোট অনুচ্ছেদে লিখিত খবর বা নিবন্ধ পাঠক স্বচ্ছন্দে পড়তে পারেন।

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১. Journalist' Handbook, Indian Journalists' Association, Calcutta, May 31, 1961.

২. IJA Annual 1991, 249B, B. B. Ganguly Street, Calcutta – 700 012.

৩. Law of the Press in India, Durga Das Basu, Prentice Hall of India, New Delhi, 1980.

৪. Without Fear or Favour, Harrison E. Salisbury.

৫. বাংলার ক'জন সেরা সাংবাদিক, গণমাধ্যম কেন্দ্র, কলকাতা - ৭০০ ০২০।

৬. The Imperial Post, Tom Kelly, William Morrow and Company, INC New York, 1983.

একক ৬ □ সম্পাদনা

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ সম্পাদনা

- ৬.২.১ অক্ষরবিন্যাস
- ৬.২.২ শিরোনাম
- ৬.২.৩ পাতা সাজানোর খসড়া
- ৬.২.৪ প্রুফ সংশোধন
- ৬.২.৫ প্রদর্শনকলা ও অঙ্গসজ্জা
- ৬.২.৬ চিত্র প্রদর্শনকলা
- ৬.২.৭ সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর সম্পাদনা
- ৬.২.৮ লেখচিত্র
- ৬.২.৯ সাময়িকী সম্পাদনা
- ৬.২.১০ মুখবন্ধ ও বিশদ বিবরণ
- ৬.২.১১ অনুচ্ছেদকরণ

৬.৩ সারাংশ

৬.৪ অনুশীলনী

৬.৫ উত্তর-সংকেত

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৬.০ উদ্দেশ্য

কিছু খবর এবং কয়েকটি নিবন্ধ, ফিচার ও মন্তব্য লিখে ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিলেই একটি খবরের কাগজ তৈরি হয়ে যায় না। খবর ও অন্যান্য লেখা শুরু করার আগে থেকেই প্রতিদিনের খবরের কাগজ প্রস্তুত করার পর্ব আরম্ভ হয়ে যায়। ভোরের আলো ফোটার সময় ছাপা হয়ে কাগজ বেরিয়ে যাবার পর সেই পর্ব শেষ হয়। তার কয়েক ঘণ্টা পরে আবার প্রাণের সাড়া জাগে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে। তার অন্তর্বর্তীকালে যে সব কাজ সুসম্পন্ন করতে হয় তার বিবরণ দেওয়াই এই এককটির উদ্দেশ্য।

৬.১ প্রস্তাবনা

খবর এবং অন্যান্য বিষয়ের লিখিত বিবরণ খবরের কাগজের মূল উপাদান। অর্থাৎ সংসারের হেঁসেলের তরিতরকারি, চাল, ডাল, লবণ, চিনি, তেল, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি রসদের সঙ্গে খবর ও অন্যান্য লেখাকে খবরের কাগজের হেঁসেলের কাঁচা উপাদানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু ভাল বাজার হাতে পেলেই সুগৃহিণীর কাজ ফুরিয়ে যায় না। বরং তা শুরু হয়। কাঁচা উপাদানগুলি বেছে, কেটে, ধুয়ে পরিষ্কার করে, উপযুক্ত পরিমাণে তেল মশলা দিয়ে তা ভালভাবে পাক করে সুচারুরূপে পরিবেশন করার ওপর সুগৃহিণীর সুনাম নির্ভর করে। খবরের কাগজ তৈরি করার ভার যাঁদের হাতে থাকে তাঁদেরও মন দিয়ে ওই সব কাজ করতে হয়। সেই সব কাজের সঙ্গে আপনারা এই এককটির মাধ্যমে পরিচিত হতে পারবেন।

৬.২ সম্পাদনা

একটু আগেই বলা হয়েছে, কিছু খবর যোগাড় করে এবং তার সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ নিবন্ধ, সম্পাদকীয় মন্তব্য, বিভাগীয় রচনা ইত্যাদি লিখে ফেলতে পারলেই সম্পাদকমশাই নিশাবসানে একটি পূর্ণাঙ্গ টাটকা খবরের কাগজ পাঠকদের উপহার দিতে পারবেন না। তার জন্য তাঁকে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করতে হয়। এই পুরো কর্মধারাকে বলা হয় খবরের কাগজ সম্পাদনা।

এই কর্মধারা সফল হলে কাগজ তার পাঠকদের মনজয় করতে পারে। এই জন্যই বলা হয়, সম্পাদককে যেন প্রত্যেক দিন পাঠকদের ভোটে নির্বাচিত হতে হয়। দ্বিতীয় পত্রের তিন নম্বর পর্যায়ের দু'নম্বর এককে সম্পাদনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৬.২.১ অক্ষরবিন্যাস

হরফ বা অক্ষরের মাধ্যমে শব্দ সৃষ্টি করা হয়। সেই সব শব্দ সাজিয়ে শুদ্ধ বাক্যরচনা করে খবরের কাগজের বিষয়বস্তু ছাপা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ঝড়ের মতো অগ্রগতি এই কাজটায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। হরফ বা অক্ষরবিন্যাসের সাবেকি পদ্ধতি ঠাঁই পেয়েছে পুরাবস্তুর যাদুঘরে। সাবেকি পদ্ধতিতে হাত দিয়ে হরফের পর হরফ সাজিয়ে তা ছাপার ব্যবস্থা করা হত। আধুনিক খবরের কাগজ সেই পদ্ধতি বাতিল করেছে

প্রাতঃস্মরণীয় নির্লোভ ও তেজস্বী সম্পাদক শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে দাদাঠাকুর ওই সাবেকি পদ্ধতিতে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা দুটি ছাপার ব্যবস্থা করতেন।

তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি কথা আপনাদের জানা দরকার। তাঁর জন্ম ১২৮৮ সালের ১৩ বৈশাখ। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর শহর থেকে এক মাইল দূরে এক অজ পাড়াগাঁ। গ্রামের নাম দফরপুর। ১৯০২ সালে তিনি সেখানে একটি অতি ক্ষুদ্র ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স একুশ-বাইশ। কলকাতার প্রসিদ্ধ কাগজ ব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে ও তাঁর সাহায্যে শরৎ পণ্ডিত একটি কাঠের তৈরি পুরনো প্রেস, ছাপাখানার কিছু সরঞ্জাম এবং এক খণ্ড প্রিন্টার্স গাইড কিনে গ্রামে ফেরেন। দাম পড়েছিল মাত্র ৪৬ টাকা।

সেই ছাপাখানার একটু বিবরণ দিই। ছাপাখানাটির নাম ছিল পণ্ডিত প্রেস। তাতে চেক-দাখিলা, নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি উপহার এই সব ছাপা হত। দাদাঠাকুর নিজেই বলতেন, "আমার ছাপাখানা হালফ্যাশানি ছাপাখানা নয়। ..... আমার ছাপাখানার আমিই প্রোপাইটার, আমি কম্পোজিটার, আমি প্রুফরিডার, আমিই ইঙ্কম্যান। কেবল প্রেসম্যান আমি নই — সেটি ম্যান নয়, উওম্যান, অর্থাৎ আমার অর্ধাঙ্গিনী। ছাপানোর কাজে ব্রাহ্মণী আমাকে সাহায্য করেন। ঘরের মাঝে আমার টাইপ রাখার কেস। মাটির মেঝেতে ঠিক কাঠের কেসের মতোই সারি সারি গর্ত করে সাজিয়ে, সেই সব ফোঁকরে এক একটি ছোট ছোট মাটির ভাঁড় বসিয়ে তার মধ্যে টাইপ রেখেছি।"

দাদাঠাকুর পরে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এবং 'বিদূষক' নামে দুটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তার প্রয়োজনে তিনি আরও একটু উন্নত ধরনের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার ইতিহাসও বেশ চমকপ্রদ। একটু পুরনো অথচ পত্রিকা ছাপার উপযুক্ত একটি মেশিনের সন্ধানে দাদাঠাকুর হাজির হলেন আজব শহর কলকাতায়। মেশিন খুঁজতে খুঁজতে দাদাঠাকুর একটি কোম্পানির অফিস ঘরে সটান ঢুকে পড়লেন। ঢুকে দেখলেন, কর্মকর্তাটি একজন সাহেব। তাই দাদাঠাকুর সাহেবি কেতা মতো গুড মর্নিং বলে সম্বোধন করলেন।

খালি গা, খালি পা, কোঁচার কাপড় কোমরে বেড় দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা, এক হাতে টিনের চোঙার মতো একটা বাক্স, অন্য হাতে একটি কলিকাশীর্ষ হুক্কা, বগলে ছাতা।

এই অভিনব অভ্যাগতের আগমনে ও তাঁর গুড মর্নিং সম্ভাষণে বিস্মিত সাহেব ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "Are you coming from a jungle? (তুমি কি জঙ্গল থেকে আসছ?)

দাদাঠাকুর ইংরেজিতে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "You are right, I am coming from a jungle."

একটা নেহাতই গাঁইয়ার মুখে এ রকম চোস্ত ইংরেজি জবাব শুনে কৌতূহলী হয়ে সাহেব জানতে চাইলেন, "কী করো তুমি?"

দাদাঠাকুরের জবাব, "আমি একখানা জংলী কাগজের জংলী এডিটর।"

এই সাহেব দাদাঠাকুরের কথাবার্তায় চমৎকৃত হয়ে তাঁকে ১০০ টাকা দামে একটি ছাপাখানা কিনে দিলেন। এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সুরেশচন্দ্র মজুমদারের। তিনি ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক।

এই প্রেস থেকে দাদাঠাকুর তাঁর সম্পাদিত কাগজ দুটি ছাপতেন। তাঁর একটির নাম ছিল 'বিদূষক'। পত্রিকাটির মলাটে লেখা থাকত "ধামাধরা উদারপন্থী দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র"। নিজেকে সম্পাদক বলে পরিচয় না দিয়ে লেখা হত "সেবাইত—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত"।

সেকালের ছাপাখানার হরফবিন্যাসের কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিক দাদাঠাকুরের প্রসঙ্গে এই কথাগুলি এসে গেল। আর দু'চারটে কথা বলে আমরা দাদাঠাকুর প্রসঙ্গ শেষ করব।

মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোকান্দীতে একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সে অনুষ্ঠানে দাদাঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। পরে শাস্ত্রীমহাশয় একটি বইয়ে লিখেছিলেন—

"জেমোকান্দীতে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল—তাঁহার নাম সোজাসুজি শরৎ পণ্ডিত—বিদূষকের এডিটর, তিনি মুখে মুখে পদ্য লেখেন, তাঁর কাগজও পদ্যে। ..... ইনি খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বেশ মিষ্টি করিয়া সকলকে হক কথা শুনাইয়া দেন। বেচারার জাঁকজমক কিছুই নাই—সদানন্দ পুরুষ।"

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দাদাঠাকুরের আমলের মুদ্রণ ব্যবস্থা বিদায় নিল। বিশেষ করে দৈনিক খবরের কাগজ ছাপার জন্য অক্ষরবিন্যাসের কাজ লাইনো মেশিনেই করা আরম্ভ হল।

এই মেশিনে অপারেটর টাইপের কী বোর্ডে (Key Board) স্থাপিত অক্ষরের বোতাম টিপে টিপে একটি করে সুসংবদ্ধ লাইন তৈরি করতেন। হরফ তৈরি হত সীসা এবং আরও কয়েকটি ধাতুর গরম গলানো মিশ্রণ দিয়ে। তরল ও গরম মিশ্রণ থেকে হরফবিন্যাসের এই পদ্ধতিকে বলা হত Hot Metal Process। মোটরে উৎপন্ন শক্তির সাহায্যে লাইনো মেশিন সক্রিয় হত।

চল্লিশের দশকের শেষে, বা পঞ্চাশের দশকে মুম্বাইয়ের টাইমস অব ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর মালিক রামকৃষ্ণ ডালমিয়া কলকাতা থেকে সত্যযুগ নামে একটি খবরের কাগজ বার করেন। তার ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন প্রতাপকুমার রায়। লাইনো মেশিন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন (পদ্মপত্রে জলবিন্দু, সাপ্তাহিক বর্তমান, ৩ আগস্ট ২০০২), "বোম্বাই থেকে পুরাতন পাঁচখানা লাইনো টাইপ মেশিন এসে গেল। কী বোর্ডের চাপি টিপে লাইন লাইন কম্পোজ করার মেশিন। সিসা গরম হচ্ছে। প্রত্যেকবারই নতুন টাইপের সৃষ্টি হচ্ছে।"

যথাসময়ে সত্যযুগ বাজারে বেরিয়ে গেল। প্রতাপকুমার লিখছেন (ঐ, সাপ্তাহিক বর্তমান, ১০ আগস্ট ২০০২), "যদিও আমাদের ছাপার কৌশল পুরনো, যত্ন করে ছাপা হয় বলে সত্যযুগ দেখতে ঝকঝকে। তার ওপর কম্পোজ করা হয়েছে লাইনো টাইপে। তার জন্য অক্ষরগুলি পরিচ্ছন্ন এবং পড়ায় সাহায্য করে।"

খবরের কাগজ উৎপাদনে গরম ধাতু পদ্ধতিও স্থায়ী হলনা। কালক্রমে তার জায়গায় এল কম্পিউটারে ফটোটাইপ সেটিং (Photo Type Setting বা PTS) পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মিশ্র গরম ধাতুতে লাইনো যন্ত্রে তৈরি হরফ সাজবার ব্যবস্থা উঠে গেল। চালু হল হরফের ছবিতে শব্দ ও বাক্যসৃষ্টির পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে DTP বা Desk Top Publishing পদ্ধতিও বলা হয়।

ক্রমে সেই ব্যবস্থাও বিদায় নিল। খবরের কাগজের হরফবিন্যাসের কাজ এই পরিবর্তনে আরও উন্নত হল। এল আরও উন্নত প্রযুক্তির কম্পিউটার। তার অঙ্গগুলি হল কি বোর্ড (Key Board), মাউস (Mouse), প্রিন্টার (Printer), স্ক্যানার (Scanner), হার্ড ডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক ইত্যাদি যন্ত্রাংশ। এল আরও উন্নত প্রযুক্তির সফটওয়ার। এই সব যন্ত্রাংশের মিলিত প্রচেষ্টায় অতি দ্রুতগতিতে লেখা যায়, ছবি আঁকা যায়, ছবি বদল করা যায়, গ্রাফিক্স (Graphics) সৃষ্টি করা যায়। কোন জিনিষটা কেমন হল তা কম্পিউটারের পর্দায় (Monitor) সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, যাচাই করা যায়, চটপট ভুল সংশোধন করা যায়, হরফের দৈর্ঘ ও প্রস্থ প্রয়োজনমত ছোট বা বড় করা যায়।

এমন কী, লেখা ছবি গ্রাফিক্স যে রঙে যেভাবে স্থাপন করে (Lay Out) পুরো পাতা সাজান হয় ঠিক সেভাবে তার একটি প্রতিচ্ছবি (Print Out) কম্পিউটারের প্রিন্টার থেকে বার করে নেওয়া যায়।

এই পদ্ধতির চালু নাম ডিটিপি (DTP)। আপনারা আগেই জেনেছেন ডিটিপি কাজ করে কম্পিউটারের মাধ্যমে। কম্পিউটার দেখতে অনেকটা টেলিভিশনের মত। আয়তন ও কর্মক্ষমতার বিচরে কম্পিউটার চার রকমের হয় তার মধ্যে যেটি সর্বাপ্রেক্ষা ছোট তাকে পার্সোনাল কম্পিউটার (Personal Computer) বা পিসি (P.C.) বলে। পিসি-তে কাজ করতে একাধিক ব্যক্তির দরকার হয় না, একজনই যথেষ্ট।

অনেক রকম যন্ত্রাংশ নিয়ে কম্পিউটার তৈরি হয়। তার মধ্যে যেগুলির মাধ্যমে কম্পিউটারকে কাজের

নির্দেশ (Command) দেওয়া যায় সেগুলিকে বলে ইনপুট ডিভাইস (Input Device)। কী বোর্ড, মাউস, ট্যাবলেট বা গ্রাফিক্স প্যাড ইত্যাদি যন্ত্রাংশ ইনপুট ডিভাইসের অন্তর্গত। কী বোর্ডে থাকে প্রয়োজনীয় ভাষার বর্ণমালার সব হরফ, ০ থেকে ৯ সংখ্যা, যদি ও ছেদচিহ্ন। এর বোতামগুলি প্রয়োজনমত টিপতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের পর্দায় লেখার পর লেখা ফুটে উঠতে থাকে।

পুরো পাতার বিষয়বস্তু কম্পিউটারের মধ্যে মজুত হয়ে গেলে তা থেকে পুরো পাতার প্রিন্ট আউট বার করা হয়। প্রিন্ট আউটের ভিত্তিতে নেগেটিভ তৈরির পর সেটি সম্পাদকীয় বিভাগের হাত থেকে চলে যায় মুদ্রণ বিভাগে প্রিন্টারের হাতে। তিনি নেগেটিভ থেকে প্লেট তৈরি করে কাগজ ছাপার জন্য প্রস্তুত হন।

একটি খবর বা একটি নিবন্ধ লেখা সম্পূর্ণ হলে কী বোর্ডের আর একটি নির্দিষ্ট বোতাম টিপে তা কম্পিউটারের মধ্যেই মজুত রাখা হয়। চিফ রিপোর্টার, চিফ সাব, বার্তা সম্পাদক বা সম্পাদক ইচ্ছা করলে অন্যের কম্পিউটারে মজুত যে কোন লেখা তাঁর নিজের পিসি'র পর্দায় টেনে এনে দেখতে ও সম্পাদনা করতে পারেন।

লেখা তৈরির এই সর্বাধুনিক পদ্ধতিকে বলা হয় Cold Process — শীতল পদ্ধতি। তার কারণ হল, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে এইসব যন্ত্র স্থাপন করতে হয়। শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণহীন পরিবেশে এই বিভাগের কাজ চলে। লাইনো যন্ত্রে হট মেটাল পদ্ধতির উত্তপ্ত ও কালিঝুলি লিপ্ত পরিবেশ আজ অতীতের ব্যাপার। এসব হল শীতল পদ্ধতির আশীর্বাদের দিক।

এখন কম্পিউটার সম্পর্কে আরও কিছু প্রাথমিক বিষয় জেনে নিন। এর ইনপুট ডিভাইস (Input Device) সম্পর্কে আগে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। এবার আউটপুট ডিভাইস (Out Device) সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি।

কম্পিউটার ব্যবহারকারী বা চালকের নির্দেশ (Command) পালনের পর যে সব যন্ত্রাংশের মধ্যে দিয়ে তার ফল জানা যায় তার সবগুলিকে বলে আউটপুট ডিভাইস। মনিটর এবং প্রিন্টার আউটপুট ডিভাইসের অন্তর্ভুক্ত দুটি যন্ত্রাংশ। মনিটর হল কম্পিউটারের পর্দা। এই পর্দায় অপারেটরের নির্দেশমত লেখা, ছবি, গ্রাফিক্স ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। প্রাপ্ত প্রতিচ্ছবির অনুলিপি নির্দেশ ছাপিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন থাকলে কম্পিউটারকে দিলেই হল। কম্পিউটারের প্রিন্টার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়ের অনুলিপি ছাপিয়ে আপনার হাতে তুলে দেবে।

কম্পিউটারের যে সব যন্ত্রাংশ সবসময়ে আমাদের চোখের সামনে থাকে সেগুলিকে হার্ডওয়্যার বলা হয়। যেমন— কী বোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি। আর কম্পিউটারকে যেসব কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় তার প্রত্যেকটিকে বলে প্রোগ্রাম। অনেকগুলি প্রোগ্রামের সমষ্টিকে বলে সফটওয়্যার। সফটওয়্যার না থাকলে কম্পিউটার একটি অকেজো বস্তু। সফটওয়্যারহীন কম্পিউটারকে মগজহীন মানুষের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

কম্পিউটার সম্পর্কে কয়েকটি গোড়ার কথা আপনারা জানলেন। তা জানতে জানতে আপনাদের মন প্রশ্ন জেগে থাকতে পারে কম্পিউটার (Computer) জিনিষটা কী?

কম্পিউটারের প্রথম ও সবচেয়ে বড় পরিচয় হল যন্ত্র বর্ণ ও সংখ্যার ভিত্তিতে পাঠ্যবস্তু সৃষ্টি, মজুত, সংশোধন ও সরবরাহ করে। (First and foremost a machine to create, store, manipulate and deliver alphanumeric text.) এই যন্ত্র হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে কাজ করে।

কম্পিউটারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর অবিশ্বাস্য গতি। এক যন্ত্রে অনেকগুলি কাজ করার ক্ষমতা এবং অসাধারণ স্মরণশক্তি। কোন মানুষ বা আর কোন যন্ত্র এই তিনটি ব্যাপারে কম্পিউটারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পরে না।

কম্পিউটারকে চেনাবার জন্য ডক্টর জন জি কেমেনি (Dr. John G. Kemeny) একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি কে সেটা জানা বিশেষ দরকার। তিনি গণিত এবং দর্শন শাস্ত্রে একজন জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি এক সময়ে আলবার্ট আইনস্টাইনের গবেষণায় সহকারীর (research assistant) কাজ করেছেন। পরে তিনি আমেরিকায় দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন। কম্পিউটারের ক্রমোন্নতিতে তাঁর মূল্যবান ভূমিকা ছিল।

তিনি ম্যান অ্যান্ড দ্য কম্পিউটার (Man and the Computer) বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন মানুষ এ যাবৎ যত ভৃত্যের সন্ধান পেয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহনশীল ও বিশ্বস্ত ভৃত্য হল এই কম্পিউটার (The computer is the most patient and obedient servant that man has ever found)।

খবরের কাগজের কাজে হরফকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। হরফের মাপের ওপর এই শ্রেণিবিভাগ নির্ভর করে। হরফের উচ্চতা ও প্রস্থের ওপর তার মাপ নির্ভর করে। মুদ্রণ ব্যবস্থায় অক্ষরের মাপের হিসাবের এককে বলা হয় পয়েন্ট (Point)।

খবরের বিশদ বিবরণ (body) এবং শিরোনাম (headline) ছাপার জন্য আলাদা মাপের হরফ ব্যবহার করা হয়। বিশদ বিবরণ ছাপার জন্য যে হরফ ব্যবহৃত হয় তাকে বলে বডি টাইপ (body type)। শিরোনাম ছাপার জন্য ব্যবহৃত হরফকে বলে ডিসপ্লে টাইপ (Display type)।

কম্পিউটারের যুগে বডি টাইপের সাধারণ মাপ ১০ পয়েন্ট থেকে ১২ পয়েন্ট হয়। ডিসপ্লে টাইপ ২৫ পয়েন্ট থেকে আরম্ভ হয়ে বাড়তে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী ডিসপ্লে টাইপের দৈর্ঘ-প্রস্থ বৃদ্ধি করা যায়। দৈর্ঘ-প্রস্থ স্থির করার পর কলমের আয়তনের মধ্যে ধরাবার প্রয়োজনে নির্দিষ্ট পয়েন্টের প্রস্থকে সরু বা মোটা, ভারি বা হালকা করে নেওয়া যায়। ধাতুর তৈরি হরফ ব্যবহারে এই সুবিধাগুলি পাওয়া যায় না।

নীচে বিভিন্ন পয়েন্টের মাপে কম্পিউটারে তৈরি হরফের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল—

নেতাজি সুভাষ ১০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ১২ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ১৬ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ২০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ২৫ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৩০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৩৫ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৪০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৪৫ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৫০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৫৫ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৬০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৬৫ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৭০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৭৫ পয়েন্ট

হরফগুলির মাপের তুলনা করলে আপনি বুঝতে পারবেন ১০, ১২, ১৬ বা ২০ পয়েন্টের টাইপে আপনি কোন খবরের শিরোনাম রচনা করবেন না। ১০ পয়েন্ট টাইপ আপনি বডি টাইপ হিসাবে ব্যবহার করলে তা পাঠকদের পড়তে খুব কষ্ট করতে হবে। এত কষ্ট পাঠক কারো মুখ চেয়ে মেনে নেবেন না। ১৬ বা ২০ পয়েন্ট টাইপ বডি টাইপ হিসাবে ব্যবহার করলে পাঠকের পড়ার খুব সুবিধা হবে ঠিকই, কিন্তু তাতে অনেক বেশি জায়গার বাজে খরচ হবে। এত বাজে খরচ কর্তৃপক্ষ স্বীকার করবেন না।

অন্যদিকে, এক কলম মাপের কোন শিরোনাম আপনি ৭৫ পয়েন্ট টাইপ ব্যবহার করতে চাইলে পারবেন না। এক কলম মাপের খবরের শিরোনামের হরফের উপযুক্ত মাপ ২৫ পয়েন্ট। ৮ কলম জোড়া ফলাও শিরোনামের জন্য হরফের পয়েন্ট অনেক বেশি বাড়িয়ে না নিলে তা মানানসই হবে না।

হরফের মাপের রকমফেরের মত হরফের ধাঁচ ও গঠনেরও রকমফের হয়। কাগজে কোন ধাঁচ ও গঠনের হরফ ব্যবহার করা হবে তা সম্পাদকীয় বিভাগের দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও পাঠকের রুচি এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

উপরের অনুচ্ছেদে আপনারা জেনেছেন হরফের মাপের মত হরফের ধাঁচ ও গঠনেও বৈচিত্র্য আছে। নীচে তার কিছু নমুনা দেওয়া হল—

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন
নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন
নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

৬.২.২ শিরোনাম

খবরের বিষয়বস্তুর পরিচয় দেয় তার শিরোনাম। ব্যস্ত পাঠক কাগজ হাতে নিয়ে চটপট শিরোনামে চোখ বুলিয়ে ঠিক করেন, তিনি কোন কোন খবর পড়বেন। তার মধ্যে কোন কোন খবরের পুরোটা তাঁর পড়া দরকার, কোন কোন খবরের পুরোটা না পড়লেও চলবে তিনি তাও ঠিক করেন খবরের শিরোনাম দেখে। শিরোনাম পড়েই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, কোন খবরটা তিনি মোটেই পড়বেন না এবং কোনটা সবার আগে পড়বেন।

এই সব কারণে এক একজন সাংবাদিক খবরের শিরোনামকে এক একভাবে বর্ণনা করে থাকেন। কেউ বলেন, খবরের শিরোনাম খবরের বিজ্ঞাপন। কেউ বলেন, খবরের শিরোনামগুলি সেদিনের কাগজের সূচীপত্র। আর কেউ শিরোনামকে বলেন, খবরের জানলা।

জানলা দিয়ে দেখা যায় ঘরের মধ্যে কী আছে। ঠিক তেমনি, শিরোনামের ভেতর দিয়ে দেখে নেওয়া যায় খবরের মধ্যে কী আছে।

নিউজ ডেস্কের এলাকায় খবরের শিরোনাম সম্পর্কে শেষ কথা বলে থাকেন চিফ সাব। যে সাব-এডিটর যে খবরটি সম্পাদনা করেন বা অনুবাদ করেন তিনিই সেই খবরের শিরোনাম রচনা করেন।

সাব-এডিটরের লেখা শিরোনাম চিফ সাব বহাল রাখতে পারেন, দরকার মনে করলে তা বদলেও দিতে পারেন। তেমন গুরুত্বপূর্ণ খবর হলে চিফ সাব নিজেই শিরোনাম লিখতে পারেন।

শিরোনাম খবরের নির্যাস স্পষ্ট ও সরল ভাষায় এবং কম কথায় লিখতে হয়। শিরোনামে অতিরঞ্জনের কোন সুযোগ নেই। যে সাব-এডিটর যত কম অথচ উপযুক্ত শব্দ সাজিয়ে শিরোনাম পরিবেশন করতে পারেন তিনি তত যোগ্য সাব-এডিটর বলে স্বীকৃত হন। শিরোনাম লেখায় ভাষার মারপ্যাঁচ বা পাণ্ডিত্য ফলাবার চেষ্টা করবেন না। কারণ, সব পাঠক তো পণ্ডিত নন যে ভাষার সব মারপ্যাঁচের কুয়াশা ভেদ করে খবরের মর্মে পৌঁছলে সক্ষম হবেন। শিরোনাম লেখার সময় তাই মনে রাখত হবে খবরের কাগজ শুধু পণ্ডিতরাই পড়েন না সাধারণ শিক্ষিত লোকেরাই কাগজের পাঠকদের গরিষ্ঠ অংশ।

খবরের পরিচয় দেওয়া ছাড়াও সুলিখিত শিরোনাম কাগজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। টপ (Top), ডবল কলম, তিন বা চার কলম। বিশেষ ক্ষেত্রে সাত বা আট কলম জোড়া শিরোনাম দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কোন খবরের শিরোনাম প্রস্থে এক কলম টপ হবে অথবা কোন খবর আট কলমের ব্যানার হবে তা খবরের গুরুত্ব এবং সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির খবরের গুরুত্ব (News Sense) বোঝার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।

কিন্তু অঙ্ক, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ফুটবল বা হাডুডু খেলার যেমন বাঁধাধরা নিয়ম থাকে খবরের কাগজের শিরোনাম লেখার তেমন কোন অলঙ্ঘনীয় নিয়ম নেই। তাই একই খবরের শিরোনাম বিভিন্ন কাগজে বিভিন্ন মাপে ও ভাষায় লেখা হয়ে থাকে।

উপরের অনুচ্ছেদে আপনার Banner — ব্যানার নামে একটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। যে সংবাদের শিরোনাম প্রস্থে কাগজের প্রথম পাতার এক কলম থেকে আট কলম পর্যন্ত জায়গা জুড়ে ছাপা হয় তাকে ব্যানার হেডলাইন বলা হয়। রোজ রোজ একটা না একটা খবরকে ব্যানার হেডলাইন দিয়ে প্রকাশ করলে এর ভার ও ধার অতি ব্যবহারে ক্ষয়ে যায়। রাজ্য, দেশ বা দুনিয়া কাঁপানো খবরই ব্যানার হেডলাইন পাবার দাবি রাখে। দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি বোঝার সুবিধা হবে।

ঘটনাটি ঘটেছিল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সকালে। সেই দিন সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা ছিনতাই কর চারটি বিমান আমেরিকার তিনটি অতি গুরুত্বপুর্ণ ভবনে ও স্থানে সবেগে ধাক্কা মারে। পরদিন কলকাতার বিভিন্ন কাগজে এই খবরের ব্যানার শিরোনাম ছিল এই রকম—

১। কাগজ ক — "আমেরিকা আক্রান্ত"

২। কাগজ খ — "আমেরিকায় অভূতপূর্ব জঙ্গী হামলা

৩। কাগজ গ — "Attack on America"

৪। কাগজ ঘ — "AMERICA ATTACKED"

৫। কাগজ ঙ — "Terror Towers Over America"

৬। কাগজ চ — "বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত আমেরিকার প্রাণকেন্দ্র"

পাঠক হিসেবে আমার বিচারে ক, গ, ঘ কাগজ মূল খবরটি শিরোনাম দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, আমেরিকা আক্রান্ত হয়নি, তবুও এইভাবে শিরোনাম দিয়ে খবরটি প্রকাশ করায় পাঠক খবরটি পড়ার জন্য খুবই আকর্ষণ বোধ করতে পারেন। তার ফলে খবরটি তিনি পড়বেন ঠিকই কিন্তু পড়ার পর তাঁর মনে হবে খবরটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও শিরোনাম ফাঁপানো, বিভ্রান্তিমূলক ও অতিরঞ্জিত।

খ, ঙ এবং চ কাজ তবুও শিরোনামে মূল ঘটনাটি ছোঁয়ার চেষ্টা করেছে। খ এবং ঙ কাগজ বোঝাতে পেরেছে ব্যাপারটি আমেরিকায় জঙ্গি হামলার ঘটনা। চ কাগজের শিরোনামে অন্তত জানা যাচ্ছে, খবরটি আমেরিকার প্রাণকেন্দ্রে বিস্ফোরণের ঘটনার বিবরণ।

এগুলির পাশাপাশি পড়ুন নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত The Wall Street Journal-এর ব্যানার শিরোনাম (১২ সেপ্টেম্বর)—

"TERRORIST DESTROY WORLD TRADE CENTER, HIT PENTAGON IN RAID WITH HIJACKED JETS"

দেখুত তো, কত স্পষ্ট, কত নিটোল, কত পূর্ণাঙ্গ এই শিরোনাম। অন্য কাগজগুলির শিরোনামের তুলনায়

এই শিরোনামটিতে কয়েকটি বেশি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোন শব্দই অপ্রয়োজনীয় বলা যাবে কি? আমার মতে যাবে না।

ওই দুনিয়া কাঁপানো ঘটনাটি ঘটেছিল ১১ সেপ্টেম্বর সকালে। পরদিন সকালের জন্য তো কোন আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন কাগজ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। কাগজের ইন্টারনেট সংস্করণে দিনের তাজা খবর সময়ের সঙ্গে তাল রেখে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। ১১ সেপ্টেম্বরের জার্নাল বেলা ৩-১৫ মিনিটে ইন্টারনেট সংস্করণে শিরোনাম দিয়েছিল—

"Terrorist Attacks Hit U.S. Cities

——— o ———

Plane Crashes Level World Trade Center, Pentagon, State Department Also Struck"

আপনি বিচার করে দেখুন কলকাতার কাগজগুলির তুলনায় জার্নালের এই শিরোনাম ছিল পুরোপুরি খবরভিত্তিক। নিউইয়র্ক টাইমসও এই ব্যাপারে ইন্টারনেট সংস্করণে খবরের ওপরেই সব জোর দিয়েছিল। ১১ সেপ্টেম্বর রাত ৯-১২ মিনিটে টাইমসের ইন্টারনেট সংস্করণের শিরোনাম ছিল—

"Terrorists Attack New York and Washington

——— o ———

Thousands Feared Dead as World Trade Center Is Toppled"

পরদিন ১২ সেপ্টেম্বর টাইমসের প্রভাতী সংস্করণের শিরোনাম ছিল—

"U.S. ATTACKED

——— o ———

HIJACKED JETS DESTROY TWIN TOWERS AND HIT PENTAGON IN DAY OF TERROR"

১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবাদী বিমান হানার খবর জানার পর আমেরিকার বিভিন্ন শহরের কাগজগুলি অতিরিক্ত সংস্করণ (Extra) প্রকাশ করেছিল। কয়েকটি কাগজের অতিরিক্ত সংস্করণের শিরোনাম নীচে উল্লেখর করা হল—

The Tallahassee Democrat
"AMERICA ATTACKED"

The Tampa Tribune
"TERROR"

The Telegram Gazette
"TERROR ATTACKS"

The Times Indiana
"TERRORIST ATTACK"

The Times Leader
"AMERICA ATTACKED NEW YORK, D.C. HIT"

The Topeka Capital Journal
"U.S. UNDER SIEGE"

The Daily Breeze
"U.S. ATTACKED"

The Tri-City Herald
"TERROR ATTACK ON AMERICA"

The Tulsa World
"ATTACK ON AMERICA"

The Tuscaloosa News
"TERROR AT HOME"

The Valley News Dispatch
"TERRORISTS HIT U.S."

The Vindicator
"UNDER SIEGE"

The Virginian Pilot
"UNDER ATTACK"

The Washington Times
"HORROR"

The West Sound Sun
"AMERICA UNDER ATTACK"

The Wichita Eagle
"ATTACKED"

The Winston-Salem Journal
"TERRORIST STRIKE N.Y., WASHINGTON"

The Wyoming Tribune Eagle
"AMERICA ATTACKED"

এবার আমরা The Washington Post কাগজটির শিরোনামগুলি দেখব। ১১ সেপ্টেম্বর পোস্টের কয়েকটি ইন্টারনেট সংস্করণের শিরোনাম—

বেলা ১২-১৬ মিনিট

"Planes Crash Into World Trade Center : Explosion Rocks Pentagon"

রাত ৮-১৪ মিনিট

"President to Address Nation After Day of Terrorist Attack"

লক্ষ্য করুন, প্রথম শিরোনামে শুধু ঘটনার নির্যাস। দ্বিতীয় শিরোনামে ঘটনার নির্যাস এবং তার প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় শিরোনামে আমেরিকা তথা বিশ্ববাসীকে জানান হল, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বুশ সন্ত্রাসবাদী হামলার বিষয়ে হোয়াইট হাউসের নীতি ঘোষণা করবেন।

কিছুক্ষণ পরে বুশ জাতির উদ্দেশ্যে এই হামলা সম্পর্কে নীতি ঘোষণা করলেন। পোস্টের পরবর্তী নেট সংস্করণে তার নির্যাস—

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলায় স্তম্ভিত জাতির কাছে বুশ শপথ নিলেন হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর বদলা নেওয়া হবে ("Bush vows to avenge thousands of deaths as nation reels from attacks on World Trade Center, Pentagon").

রাত ১০-৩ মিনিট

"President Addresses Nation After Day of Terrorist Attacks"

ওই ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে পোস্ট একটি অতিরিক্ত (Extra) সংস্করণ প্রকাশ করেছিল। নামেই বোঝা যাচ্ছে প্রাত্যহিক প্রভাতী সংস্করণের ওপর বাড়তি সংস্করণ বলেই এই সংখ্যাটির নাম অতিরিক্ত বা Extra। আপনি ভাবতে পারেন অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশের প্রয়োজন হয় কেন?

এখন টেলিভিশন এবং কেবল চ্যানেল চালু হওয়ায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় বা আধ ঘণ্টা অন্তর দেশ-বিদেশের খবর পাওয়া যায়। তার আগে যখন শুধু রেডিও ছিল তখনও তার মাধ্যমে দিনের মধ্যে কয়েক বার খবর প্রচারিত হত। তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য তখন এবং এখন আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরের খবরের কাগজগুলি অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ করে থাকে। টেলিভিশনের কেবল চ্যানেলে (Cable Channel) যাকে বলা হয় Breaking the news, খবরের কাগজের অতিরিক্ত সংখ্যাকেও তাই বলা যায়।

প্রভাতী সংস্করণ বেরিয়ে যাবার পর থেকে বিকালের মধ্যে কোন মস্ত বড় ঘটনা ঘটলে অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকাশের রেওয়াজ চালু আছে। স্তালিনের জীবনাবসান, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণ, ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন বাতিল করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়, সেই রায় বাতিল করে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের খবর

সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবার জন্য কলকাতার The Amrita Bazar Patrika, যুগান্তর এবং অন্যান্য ইংরেজি ও বাংলা কাগজগুলি অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছিল। প্রতিটি অতিরিক্ত সংস্করণে ৮ কলমের ফলাও শিরোনাম (Banner) ব্যবহার করা হয়েছিল।

১১ সেপ্টেম্বর পোস্টের অতিরিক্ত সংস্করণের শিরোনাম ছিল—

"Terror Attacks Pentagon, World Trade Center"

লক্ষ্য করুন আমেরিকার আঞ্চলিক কাগজগুলির অতিরিক্ত সংস্করণের শিরোনামের তুলনায় পোস্টের অতিরিক্ত সংস্করণটির শিরোনাম হয়ত একটু বড়, কিন্তু কত স্পষ্ট। Under Siege, Under Attack, Horror, Attacked ইত্যাদি শিরোনাম আকারে ছোট নিশ্চয় কিন্তু বড়ই অস্পষ্ট, বড়ই ধোঁয়াটে। শুধুই Terror এক্ষেত্রে একটা নেহাতই অর্থহীন শব্দ, তার তুলনায় Terrorist Strike N.Y., Wasington পড়লে সবটা না হোক, কিছুটা বোঝা যায়। আর পোস্টের অতিরিক্ত সংস্করণের শিরোনামে বোঝা যায় অনেকটাই।

আর সবটাই বোঝা যায় ১২ সেপ্টেম্বরের পোস্টের এই শিরোনামে—

"Terrorists Hijack 4 Airliners, Destroy World Trade Center, Hit Pentagon : Hundreds Dead"

১১-১২ সেপ্টেম্বর পোস্টের বিভিন্ন সংস্করণের শিরোনামগুলির কী রকম বিবর্তন হয়েছিল তা আপনারা দেখলেন। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস কাগজটির দুটি শিরোনামের সঙ্গে আপনারা আগেই পরিচিত হয়েছেন। ১১ সেপ্টেম্বর রাত ৯-১২ মিনিটের ইন্টারনেট সংস্করণে এই শিরোনামটি দেখা গিয়েছিল—

"Terrorists Attack New York and Wasington"

এই শিরোনামে ঘটনাটির কাঠামো ফুটে উঠেছিল। মূল খবরের অর্ধেকটা ফুটে উঠেছিল আলাদা একটি শিরোনামে—

"Thousands Feared Dead As World Trade Center Is Toppled"

পোস্ট কিন্তু ১২ সেপ্টেম্বর পুরো ঘটনার নির্যাস একটিমাত্র শিরোনামে পরিবেশন করতে সফল হয়েছিল। এখানেই পোস্টের মুন্সিয়ানা। সেদিনের নিউইয়র্ক টাইমসের প্রথম শিরোনামটিতে বলা হয়েছিল U.S. Attacked। এটা তো ঘটনা নয়, ঘটনার অতিরঞ্জন। পোস্ট এই রকম ছলনা বাদ দিয়েই শিরোনাম রচনা করতে পেরেছিল।

ফলে তারা শিরোনামে নিহতের সংখ্যার আন্দাজ দিতে পেরেছিল। টাইমস বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তা পারেনি। এখানেই টাইমসের শিরোনামের দুর্বলতা।

এরপর আমরা আর একটি আন্তর্জাতিক মানের খবরের শিরোনাম নিয়ে আলোচনা করব। ঘটনাটি হল শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল। জাপানের ইয়োকোহামা শহরের একটি স্টেডিয়ামে সেই খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০২ সালের ১ জুলাই সেই খেলার খবর বিভিন্ন কাগজে ব্যানার শিরোনামের তলায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে কলকাতার চারটি কাগজের শিরোনাম আপনাদের আলোচনার জন্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে—

১। কাগজ ক — "শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপ ব্রাজিলেরই"

২। কাগজ খ — "RONALDO'S REDEMPTION"

৩। কাগজ গ — "KAHN'T BLOCK RONALDO"

৪। কাগজ ঘ — "World at Brazil's Feet"

আপনারা বিবেচনা করে দেখুন ওই চারটি শিরোনামের মধ্যে কোনটি খবরের মূল বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরতে পেরেছে। আমার বিবেচনায় সেই কৃতিত্ব খ কাগজটিকেই দেওয়া যায়। বাকি তিনটি কাগজ ভাষার মারপ্যাঁচ দেখাতে গিয়ে আমল বিষয়টিকেই হারিয়ে ফেলেছে।

এবার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী অপরাধের আর একটি খবরের শিরোনাম নিয়ে আলোচনা করা যাক। ২০০২ সালের ১৫ জুন বিভিন্ন কাগজে পাকিস্তানের বন্দর-শহর করাচিতে একটি নাশকতার বিষয়ে কয়েকটি খবরের কাগজের শিরোনাম ছিল এই রকম—

গ কাগজের শিরোনাম—

"Car Bomb Message to Parvez"
"পারভেজকে গাড়ি বোমার বার্তা"

কিছু বুঝলেন? কিছু মনে পড়ছে? কী সেই বার্তা?

ঘ কাগজের শিরোনাম—

"America Under Attack in Pak"
"পাকিস্তানে আমেরিকা আক্রান্ত"

কিছু জানা গেল? কিছু বোঝা গেল? কিছু মনে পড়ল?

তুলনায় ঙ কাগজের শিরোনাম—

"11 Die in Karachi Sucide Blast"
"করাচিতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ১১ জন নিহত"

চ কাগজের শিরোনাম—

"করাচিতে মার্কিন কনসুলেটের সামনে
আত্মঘাতী হামলা, হত ১১"

যে কোন সাধারণ পাঠকের বিচারে গ ও ঘ-এর তুলনায় ঙ ও চ-এর শিরোনাম স্পষ্ট। তবে ঙ এবং চ শিরোনামে "আত্মঘাতী" শব্দটি বাদ দিয়ে আরও ভালো হত। কারণ বিস্ফোরণের মূলে আত্মঘাতী হামলা, না রিমোট কন্ট্রোলের কারসাজি তা নিয়ে তাড়াতাড়ি রায় দেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া মূল ঘটনাটি করাচিতে বিস্ফোরণ এবং তাতে ১১ জনের মৃত্যুর। শিরোনাম তাই বিষয়দুটিতে সীমাবদ্ধ রাখলে তার এতটুকু অঙ্গহানি হত না। বরং সেটাই যথাযথ (accurate) হত। পরে তা প্রমাণও হয়েছিল। ফরেনসিক পরীক্ষায় জানা গিয়েছিল বিস্ফোরণ ঘটনা হয়েছিল রিমোট কন্ট্রোলের ব্যবস্থায়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে কে আর নারায়ণের উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে তৎপরতা চলে। কেন্দ্রের শাসক জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা এবং বিরোধী দলগুলির নেতারা উপযুক্ত প্রার্থীর সন্ধান করতে থাকেন। এই সময় ১৪ জুন কয়েকটি কাগজে একটি বিশেষ খবরের শিরোনাম ছিল এই রকম—

ঝ কাগজের শিরোনাম—

"Congress Ditches Left for Kalam"
"কালামের জন্য বামপন্থীদের ডুবিয়ে দিল কংগ্রেস"

ছ কাগজের শিরোনাম—

"Launching Kalam, Cong. Leaves Left
Lonely in the Orbit"
"কালামকে উৎপ্রেক্ষণ, বামপন্থীদের কক্ষপথে
একা ছেড়ে দিল কংগ্রেস"

জ কাগজের শিরোনাম—

"কংগ্রেসের সমর্থন, পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কালামই"

নিশ্চয় বুঝতে পারছেন মূল খবরটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এ পি জে আবদুল কালামের প্রার্থীপদ সম্পর্কিত। কালামকে প্রথমে প্রার্থী মনোনীত করেছিল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার সব শরিক, সহযোগী এবং বহির্ভূত কংগ্রেস দল। সংসদের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস তার দিন কয়েক দিন পরে কালামের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী না দেবার বা অন্য কাউকে সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নিল। এক্ষেত্রে মূল খবর ছিল, কালামকে কংগ্রেসের সমর্থনের সিদ্ধান্ত। এর ফলে বামপন্থীদের অবস্থা কী হল তা মূল খবরের তুলনায় গৌণ খবর। কিন্তু গ এবং ছ খবরের মুখ্য ও গৌণ দুটো দিককেই তুল্যমূল্য করে ফেলল। এতে কোন পাঠকের মনে হতে পারে, বামপন্থীদের খোঁচা দেবার জন্যই মুখ্য ও গৌণ খবরকে গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে জ কাগজের শিরোনামে গৌণ অংশটির কোন উল্লেখই থাকল না। এতে কোন পাঠকের সন্দেহ হতে পারে, বামপন্থীদের প্রতি সহানুভূতির কারণেই খবরের গৌণ অংশটি চেপে দেওয়া হয়েছে। এর কোনটাই কাগজগুলির নিরপেক্ষতা প্রমাণের পক্ষে সহায়ক হয় না।

২০০২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের খবরের শিরোনামের দিকে আর একবার নজর দিন। ওই বছেরর ২৬ জুন প্রকাশিত একটি খবরের কয়েকটি শিরোনাম নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ক কাগজ : প্রথম পাতার ৬ কলম জুড়ে শুধুই বিশ্বকাপের খবর। প্রধান সংবাদের শিরোনাম—

"তুরস্ক পা চালানোর খেলা খেলবে ধরে নিয়ে তৈরি কার্লোসরাও"

কত শতাংশ পাঠক এই শিরোনাম থেকে খবরটা বুঝতে পারবেন?

'পা চালানোর খেলা' মানে কী? খেলায় যখন 'পা' আসছে তখন ধরে নিতে হয় ব্যাপারটা ফুটবল নিয়ে। কিন্তু ফুটবল তো পায়েরই খেলা। তাহলে 'পা' না চালিয়ে উপায় কী? নাকি, বাক্যটির অন্য মানে আছে। সেটা হল তুর্কিরা খেলতে নেমে লাথির পর লাথি ছুঁড়বে, ল্যাং মারবে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের পায়ে? এর মধ্যে কে কোন মানেটা ধরবেন? তাই বলছি, এই রকম শিরোনাম অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিমূলক।

একই দিনে একই বিষয়ে খ কাগজের শিরোনাম—

"রোনাল্ডো না খেললে সমস্যা হবে ব্রাজিলের"

এই ভবিষ্যৎবাণী একজন ফুটবল পণ্ডিত রিপোর্টারের।

পরদিন রোনাল্ডো পুরো সময় খেলল না। তাতেও কিন্তু ব্রাজিলের জেতার পথে কোন বাধা পড়ল না। তাই এই রকম ভবিষ্যৎবাণীকে কাগজ কালির বাজে খরচ বলে ধরে নিতে হবে।

কিন্তু শিরোনামে প্রথম জায়গায় যে রোনাল্ডো তিনি খবরের কোন জায়গায়। বিশ্বাস করুন তিনি খবরের মুখবন্ধে জায়গা পাননি। পিছতে পিছতে চলে গেছেন পঞ্চম অনুচ্ছেদে। সেখানে তাঁকে নিয়ে খবর হল, এই ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন কিনা তা অনিশ্চিত।

পণ্ডিতের কাছে যা অনিশ্চিত, একজন পেশাদার ও দক্ষ রিপোর্টারের কাছে তা নয়। তিনি একই দিনে